তৃতীয় অধ্যায়

লোককথায় সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

বহুজনগোষ্ঠীর মিলনভূমি বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার লোককথার চিত্র আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় ফুটে উঠেছে। লোকমানসের জীবন অভিজ্ঞতা যেহেতু লোকসাহিত্যে ফুটে উঠে তাই লোককথায়ও বৈচিত্র্যময় জীবনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। লোককথায় লক্ষ করা যায় বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের ভীড়। রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকুমারী, কোটাল, চাষী, ব্রাহ্মণ, নাপিত, ভৃত্য, রাক্ষস-খোক্ষস, পরী, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, জীব-জন্তু ইত্যাদি। লোককথা একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে থাকে না। একই লোককথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া যায়। এমনকি একই অঞ্চলে একটি লোককথার বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। আসলে একটি লোককথা বিভিন্ন মাধ্যমে যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিভ্রমণ করে তখন সে সেই জায়গার জল আবহাওয়া ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন রূপ লাভ করে। আর সেই অঞ্চলের লোককথা হিসেবেই তারা পরিচিতি লাভ করে। লোককথাগুলি যেন হয়ে উঠে সেই অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ। আর সেই অঞ্চলের সমাজ চিত্রকেই যেন তারা প্রতিফলিত করে। কিন্তু তার টাইপ ও মোটিফ একই থেকে যায়। কারণ মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে নানান রকম পরিবেশে বসবাস করলেও মানুষের স্বাভাবিক কিছু প্রবৃত্তি থাকে যা অল্প স্বল্প পার্থক্য থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম। বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরাক উপত্যকার লোকজীবন তথা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্রই যেন লোককথায় ফুটে উঠেছে নানা ভাবে।

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের নিন্দনীয় প্রথা প্রায় আদিমকাল থেকেই চলে আসছে। ধনে-জনে-বলে যারা বলীয়ান তারা যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছে দুর্বলের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের শোষণ করেছে, নিজের প্রভূত্ব কায়েমের চেষ্টা করেছে। এর ফলে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণি সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। যারা দুর্বল তারা চিরকাল যে শোষিত হবে, নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের সবসময় 'ধূর' 'ধূর' 'ছি' 'ছি' করবে, সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে প্রকৃতি এমন নিয়ম তৈরি করেনি। ফলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। তবে প্রতিবাদের ভাষা বা ধরন সবসময় একরকম নয়। প্রতিবাদের ভাষা,

মাত্রা এবং রকম স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন যেমন গড়ে উঠে তেমনি নীরব প্রতিবাদও একটা বড় মাধ্যম। সরাসরি যখন শোষক ও অত্যচারীকে দমন করা সম্ভব হয় না তখন মনে মনে বা নীরবে শাপ-শাপান্ত করে, গালি-গালাজ করে, কল্পনায় অপদস্থ করে মনের জ্বালা মেটানো বা ক্ষোভকে শান্ত করা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সাহিত্যে, গল্প-কাহিনিতে এর উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে লোকসাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখা লোককথায় এই শ্রেণি-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণি সংগ্রামের চিত্রটি সুন্দরভাবে লক্ষ করা যায়। বলা যায় শ্রেণি-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণি-সংগ্রাম লোককথার এক অন্যতম দিক। বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথাগুলিতেও এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

লোককথায় মানব মনের সুপ্ত বাসনা, অবদমিত ক্ষোভ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। লোককথায় শ্রেণি-দ্বন্দ্বের বিষয়টিও একইভাবে দেখা যেতে পারে। লোককথায় দুর্বলের উপর সবলের অন্যায়, অবিচার, শোষণ যেমন দেখা যায় তেমনি এর বিপরীতে সবলের উপর দুর্বলের জয়ও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। গল্পের শেষে অত্যাচারী, প্রতাপশালী, বলবান রাক্ষস-খোক্ষস, শোষক, প্রবঞ্চক, হিংস্র জন্তু প্রভৃতিকে তাদের থেকে তুলনায় অতি তুচ্ছ, সাধারণ আর দুর্বলের হাতে পরাজিত হতে হয়, অপদস্থ হতে হয়। যেমন- সামান্য টুনটুনির জন্য রাজার সঙ্গে তার সাত রানীরও নাক কাটা যায়। এখানে টুনটুনি আসলে হয়ে উঠে নিপীড়িত ও দুর্বল শ্রেণির প্রতিনিধি। আসলে অন্যায় বা অধর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হয়। আর এক্ষেত্রে শোষিত, বঞ্চিতরাই হয়ে উঠে নায়ক। বাস্তবে না হলেও কল্পনায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোককথায় পশু-পাখি, জীব-জন্তু আসলে মানুষেরই রূপক। তাই তাদের আচরণ সম্পূর্ণভাবে মানুষেরই মতো। পৃথিবীতে এমন কোনো লোককথা বা গল্প-কাহিনি আছে কিনা সন্দেহ যেখানে শুভ শক্তিকে পরাজিত করে অশুভ শক্তি জয়ী হয়েছে। যে কোনোভাবেই হোক অশুভ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত শুভ শক্তির কাছে পরাজিত হতেই হয়। কারণ লোকসমাজ থেকে যে লোককথার জন্ম হয় তার পশ্চাতে যেমন থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমনি থাকে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা মনের ইচ্ছা। যেখানে মানুষ তার না পাওয়া বস্তুকে পেতে চায়, অধরা বস্তুকে ধরতে চায়।

বাস্তবে যা করতে পারে না তা কল্পনায় করতে চায়। অনেকখানি দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিজীবি, শ্রমজীবি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হতে হয়, শোষণের স্বীকার হতে হয়, নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অথচ তাদের প্রতিবাদ করার সাহস বা ক্ষমতা থাকে না। তাই তাদের প্রতিবাদের ভাষা যেন রূপ পায় অন্যভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> "লোকায়ত সমাজে যারা লোকসংস্কৃতির ধারক এবং বাহক, তাঁদের বড় অংশই এর অন্তর্ভূক্ত। তাই, লোকায়ত সাহিত্যে, সমাজের শ্রেণির প্রতিবাদ, ক্ষোভ, বঞ্চনা ও সংগ্রাম ইত্যাদির কথা বিবৃত হতে দেখা যায়। শ্রেণি দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সংগ্রামের নানাবিধ দলিল, লোকসাহিত্যে ফুটে উঠে।"

পৃথিবীর সব দেশের লোককথায়ই এই শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-সংগ্রাম বা প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বলে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের ধারণা। এ প্রসঙ্গে বাংলার অতি জনপ্রিয় 'টুনটুনি আর রাজা' লোককথাটির মতই 'অত্যাচারী সিংহ আর খরগোশ' (লোককথা সংখ্যা-৭)এর কথাটিও খুবই উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এই লোককথা দুটি অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয়। অবশ্য এদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠও পাওয়া যায় এতদঅঞ্চলে। এছাড়াও এজাতীয় আরও অনেক লোককথার পরিচয় পাওয়া যায় এ অঞ্চলে। এর মধ্যে বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য 'বাঘ আর কৈ মাছ', 'বাঘ আর চড়াই পাখি', 'কাক আর চড়াই', 'ব্যাঙ আর বাঘ' ইত্যাদি।

'অত্যাচারী সিংহ আর খরগোশ' লোককথাটিতে দেখা যায় যে বনে পশুরাজ সিংহের রাজত্ব। তার ভয়ে বনের সমস্ত পশুকুল আতংকিত। হিংস্র সিংহের অত্যাচারে বনের সব পশুর জীবন বিপন্ন। কেননা সিংহ বনের পশুদের খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। সব পশুরাও তার সামনে হার মেনে নিয়েছে। উপায় না পেয়ে তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিদিন একজন করে সিংহের সামনে হাজির হবে ভেট হিসেবে। এর ফলে যখন তখন সিংহের মুখে প্রাণ হারানোর চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে কিছুদিন অন্তত বেঁচে থাকা যাবে। সিদ্ধান্ত মতে একদিন একজন করে সিংহের সামনে হাজির হয়

খাদ্য হিসেবে। এই নিয়মেই দিন কাটছিল। একদিন সিংহের খাদ্য হওয়ার পালা আসে ক্ষুদ্র খরগোশের। খরগোশ ভয়ে শেষ। আর কোনো উপায় নেই। তবে মৃত্যুর আগে খরগোশ একবার শেষ লড়াই করে দেখতে চায়। কিন্তু ভয়ানক সিংহের সঙ্গে তার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব না। তবুও খরগোশ একটা পরিকল্পনা করে। চালাকির দ্বারা সিংহকে একটি কুয়োর মধ্যে এনে ফেলে হত্যা করে। অহংকারী অত্যাচারী সিংহ তার তুলনায় অতি তুচ্ছ দুর্বল সাধারণ এক খরগোশের কাছে পরাভূত হয়। অত্যাচারী তার পাপের শাস্তি পায়। বনের সমস্ত পশু রক্ষা পায়। বাহুবল দিয়ে যা করা সম্ভব হয় না বুদ্ধির সাহায্যে তা করা সম্ভব হয়। সিংহ খরগোশকে অতি তুচ্ছ ভেবেছে, যার ফলে সহজে তার ফাঁদে পা দিয়েছে। আর তাই তার হার হয়েছে, অহংকারের পতন হয়েছে। ঠিক একইভাবে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাঘ আর কৈ মাছ' (লোককথা সংখ্যা-৯) লোককথাটিতে। যেখানে দেখা যায় কৈ মাছ অহংকারী বাঘের প্রত্যাহ্বানকে স্বীকার করে এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজী হয়। শেষপর্যন্ত বুদ্ধি আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৈ মাছের দল বাঘকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে। বাঘ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে সামান্য কৈ মাছ তাকে দৌড়ে হারাতে পারবে। তাই বার বার কৈ মাছ যখন সামনে থেকে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল তখন বাঘ আশ্চর্য হয়ে আরো দ্রুত দৌড়েছে। এক সময় সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে তার আর দৌড়ানোর শক্তিই থাকে না। আর তাই তুচ্ছ কৈ মাছের কাছে পরাজিত হয়ে মাথা নত করে চলে যেতে হয় পরাক্রমী বাঘকে। এখানে লক্ষণীয় যে ক্ষুদ্র কৈ মাছ দুটি কারণে শক্তিশালী বাঘকে পরাজিত করতে পেরেছে, তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি আর বুদ্ধিবল। অহংকারী বাঘ কৈ মাছকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, অবহেলা করেছে। আর তাই সে উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে।

একইরকম চিত্র দেখা যায় 'ব্যাঙ আর বাঘের লড়াই' (লোককথা সংখ্যা - ৬) লোককথায় বাঘ আর ব্যঙ-এর ঢিল ছুড়া প্রতিযোগিতায়। সেখানে দেখা যায় যে বাঘ ক্ষুদ্র ব্যঙকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। নিজের ক্ষমতা জাহির করতে বাঘ ব্যঙকে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আহ্বান করে। ব্যাঙও পিছিয়ে যায় না। সিদ্ধান্ত হয় দুজনের মধ্যে ঢিল ছুড়ার প্রতিযোগিতা হবে। প্রথমে বাঘ একটা ছোট পাথর নিয়ে ছুড়ে মারে। পাথরটি গিয়ে অনেক দূরে পড়ে। উপস্থিত সবাই ভাবে যে ব্যাঙের পক্ষে এত দূর ঢিল

ছুড়া কোনোভাবে সম্ভব না। কিন্তু ব্যাঙ হারতে মানতে রাজী নয়। সেও একটা ছোট পাথর নিয়ে তার সাধ্যমতো শক্তিতে ছুড়ে মারল। আর ঢিলটি গিয়ে পড়ল একটি পাখির উপরে। আর পখি ঢিলটি গায়ে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। পাখিটি এত উপরে উড়ে গেল যে তাকে দেখতে ছোট ঢিলটির মতোই লাগছিল। সবাই পাখিটিকে ব্যাঙের ছুড়ে মারা ঢিল বলে ভাবল। আর প্রতিযোগিতায় বাঘকে পরাজিত করে জয়ী হল ব্যাঙ। কৈ মাছের মতো ব্যাঙের কাছে পরাজিত হল বাঘ। সামান্য তুচ্ছ ব্যাঙের কাছে বাঘের অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল।

'বাঘ সিংহ আর শেয়াল' (লোককথা সংখ্যা-৪) লোককথাটি বিশেষ অর্থবহ। লোককথাটিতে দেখা যায় বাঘ আর সিংহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। হরিণ শিকারে সিংহ বাঘকে সাহায্য করে। কিন্তু মৃত হরিণের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দুজনের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এক দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। মৃত হরিণের উপর অধিকার নিয়ে যখন সিংহ আর বাঘ লড়াইয়ে ব্যস্ত তখন একটি শিয়াল এসে মাঝখান থেকে মৃত হরিণটিকে নিয়ে যায়। লোককথাটির বিশ্লেষণ করলে আমরা তিন ধরনের চরিত্র এখানে লক্ষ করতে পারি। যেমন- বাঘ আর সিংহ হচ্ছে ক্ষমতাধর শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। যারা দুর্বল অসহায়দের ভোগ করতে চায়। শোষণ করতে চায়। তাদের কাছে স্বার্থটাই বড়। তাই হরিণটাকে দুজনেই একা একা ভোগ করতে চায়। নিজের থেকে একটু অংশও কেউ ছাড়তে চায় না। এরজন্য প্রাণপণ লড়াই করে। আর অন্যদিকে শিয়াল হচ্ছে ধূর্ত সুবিধাভোগী সুযোগসন্ধানীর রূপক। যে দূর থেকে বসে তামাশা দেখে আর সুযোগ বুঝে অন্যের অংশ ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। যেমন বাঘ আর সিংহ যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল তখন শিয়াল দূর থেকে বসে তা উপভোগ করেছে। আর সুযোগ পেয়েই হরিণটিকে নিয়ে পালিয়েছে। পেট ভরে হরিণের মাংস খেয়েছে। এই শোষক আর সুবিধাভোগীর ভোগ্য বস্তু অসহায় সাধারণ হরিণ। যার শোষিত বা অন্যের আহারে পরিণত হওয়া ছাড়া গতি নেই। কেউ না কেউ তাকে ভোগ করবেই। কারো হাত থেকে তার নিস্তার নেই। শোষক আর শোষিত নিপীড়িত শ্রেণির চিত্রটি যেন এই লোককথাটিতে আমরা দেখতে পাই।

'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-১০) লোককথাটি খুবই জনপ্রিয়। এর বহু পাঠ পওয়া যায়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরাক উপত্যকায়ও এই লোককথাটি খুবই প্রচলিত। আমরা যার কাছ থেকে এই লোককথাটি সংগ্রহ করেছি তার আদি বাড়ি বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। দেশভাগের সময় তার পিতৃপুরুষ বরাক উপত্যকায় চলে আসে। শ্রেণি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে 'কাক ও চড়াই'-র লোককথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে আমরা দেখতে পাই ধূর্ত কাক নিজের বন্ধু চড়াইকে খেয়ে ফেলার ফন্দি করে। কিন্তু দূর্বল হয়েও চড়াই নিজের বুদ্ধির বলে কাকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। আর কাকও তার ধূর্তামীর উপযুক্ত শাস্তি পায়। পাখিদের মধ্যে কাককে ধূর্ত বলে ধরা হয়। ধূর্ত প্রকৃতির চরিত্রের সবসময় একই উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে অন্যের জিনিস হাতিয়ে নেওয়া যায়। সব সময় তাদের লোভ থাকে অন্যের জিনিসের প্রতি। অন্যের ভালো তারা দেখতে পারে না। তাই তো দেখতে পাওয়া যায় যে 'চিনা' খেয়ে খেয়ে চড়াইর স্বাস্থ্য ভালো হতে দেখে বন্ধু হিসেবে যেখানে কাকের খুশি হবার কথা সেখানে তার লোভ হয়েছে। কাক চেয়েছে কোনোভাবে ফন্দি করে চড়াইকে খেয়ে ফেলার। তাই সে বাজি ধরেছে চড়ইার সাথে। কারণ সে ভালো করেই জানত যে সামান্য চড়া তার সাথে জিততে পারবে না। আর হয়েছেও তাই। চড়াই বাজিতে হেরেছে, কাক জয়ী হয়েছে। কিন্তু 'চড়াবন্ধের' বুক খাওয়ার আশা কাকের পূরণ হয়নি। বরঞ্চ সবার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে ফিরতে শেষপর্যন্ত আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে দুষ্ট কাকের।

আমাদের সমাজেও দুষ্ট চরিত্রের লোকের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় যেমন আমরা দেখতে পাই জমিদার তার বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমিকে কৌশলে হাতিয়ে নেয়। ঠিক এইরকম শ্রেণির লোকেদের দেখা যায় তারা সব সময় দুর্বলদের উপর সবসময় অত্যাচার করে। তাদের শোষণ করে নানা ভাবে। উপেনের কোনো উপায় না থাকায় শেষপর্যন্ত সর্বশক্তিমান উপরওয়ালার কাছে বিচার দেয়। সাধরণ মানুষেরও সেই ভগবান ভরসা ছাড়া গতি নেই। মনে মনে তারা অত্যাচারীর শাস্তি চায়। লোকসাহিত্যে কাক ধূর্ত চরিত্রের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ফলে এই গল্পে কাক শোষক চরিত্রের প্রতীক। আর 'চড়া' অর্থাৎ

চড়াই পাখি সহজ সরল সাধারণ মানুষ। প্রথমে দুষ্ট শক্তি বা অশুভ শক্তি জয়ী হলেও শেষপর্যন্ত যে অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে আর শুভ শক্তি তথা সত্যের জয় হয় এই বার্তাটি যেন ফুটে উঠে এই লোককথায়। আসলে এখানে শোষককে শাস্তি দিয়ে মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে পূরণ করা হয়েছে। যেন পরোক্ষে মানসিক শান্তি লাভ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শোষকরা যে নানা ছলনায় সবসময় তার চাইতে দুর্বলদের শোষণ করতে চায়, সব কিছু কেড়ে নিতে চায় এর চিত্রও ফুটে উঠে।

একইরকম ভাবে 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব' (লোককথা সংখ্যা-৫) লোককথাটিতেও দেখা যায় যে বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর কথার কুমীর বাঁদরের কলিজা খেতে চায়। যদিও কুমীর আর তার স্ত্রীর এই কুটিল ইচ্ছা শেষপর্যন্ত পূরণ হয়নি। বুদ্ধিমান বাঁদরের বুদ্ধির কাছে কুমীর পরাজিত হয়। নিজের কলিজা গাছে রেখে এসেছে বলে বাঁদর কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পায়। এখানে কুমীর বাঁদরের থেকে শক্তিশালী প্রাণী। কিন্তু তাকেও তার তুলনায় দুর্বল বাঁদরের কাছে পরাজিত হতে হয়েছে।

বরাক উপত্যকার আরেকটি খুবই পরিচিত লোককথা 'বাঘ ভালুক ও বাঁদর' (লোককথা সংখ্যা-২)। এখানে দেখা যায় যে একটি ডোবায় অতি সুন্দর আর ভালো জল ছিল। আর ভালুক এসে সেই ডোবার দখল নেয়। আর বাঁদরকে বসিয়ে দেয় পাহাড়াদার হিসেবে। যাতে অন্য কেউ এই ডোবার জলপান করতে না পারে। একে একে বনের পশুরা তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ডোবার কাছে আসতে থাকে। কিন্তু কারো সাহস হয় না ভালুকের ডোবা থেকে জলপান করতে। প্রকৃতির সম্পত্তিতে সবার সমান অধিকার। কিন্তু সবার পক্ষে সেই অধিকার ভোগ করা সম্ভব হয় না। নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কেননা যারা শক্তিমান, ক্ষমতাশালী বা বলশালী তারা নিজের গায়ের জোরে সব দখল করে রাখে। অন্যকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। এখানে বনের সাধারণ অন্য পশুরা ভালুকের ভয়ে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সামান্য জল পান করতে পারে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে যারা ধনী তারা দিন দিন ধনী হচ্ছে। যতটুকু সম্ভব সম্পত্তি তারা নিজেদের দখলে রাখছে। তারা সমস্ত কিছু ভোগ করছে। আর অন্যদিকে অধিকাংশ সংখ্যক গরীব সাধারণ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে

মরছে। তাদের গায়ে কাপড় নেই, মাথার উপরে ছাদ নেই। লোককথাটিতে শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে বাঘ এসে গায়ের জোরে সেই ডোবার জল পান করতে চায়। আর বাঘ ভালুক দুজনে লড়াই করতে করতে প্রাণ হারায়। দুজনেই শক্তিধর প্রাণী। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে দুজনেই লড়াই করে মরে। যারা শক্তিশালী তাদের মধ্যে সম্পত্তি দখল বা ভোগের অধিকার নিয়ে লড়াই চলতেই থাকে। অন্যদিকে যারা দুর্বল বলহীন তাদের কিছুই করার থাকে না। বাঁদর চালাক তাই সে কিছু ভোগ করতে পারে। এই লোককথাটিতেও সমাজের ক্ষমতাধর শ্রেণির চিত্রই যেন ফুটে উঠে। আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে গিয়ে হাসির পাত্রও হয়ে উঠে। আসলে শাসক, শোষক, বলবান, ক্ষমতাশালী ইত্যাদি চরিত্রকে পরাজিত করা অপদস্থ করা যে এজাতীয় লোককথার বৈশিষ্ট্য তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে এই লোককথাটির মধ্যে বাঘ আর ভালুকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

লোককথায় হিংস্র অত্যাচারী ও বলবান পশু বা জীবজন্তুকে যেমন তাদের চাইতে ক্ষুদ্র ও দুর্বলদের হাতে পরাজিত করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, তেমনি অনেক সময় তাদের হাসির পাত্র হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিভিন্ন লোককথায় দেখা যায় বাঘ সিংহরা সমান্য পশু-পাখির কাছে হাস্যস্পদ হয়েছে। এরকমই একটি চিত্র পাওয়া যায় 'চড়াই-চড়ুনীর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-)য়। এই লোককথাটিতে দেখা যায় যে একদিন 'চড়া'র পিঠা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। 'চড়ী'কে পিঠা খাওয়ার ইচ্ছার কথা জানালে 'চড়ী' বলে যে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র যেমন শুকনো লাকড়ি, ময়দা, তেল, গুর ইত্যাদি এনে দিলেই পিঠা বানিয়ে দিতে পারবে। 'চড়ী'র কথা শুনে 'চড়া' লাকড়ি আনতে যায় জঙ্গলে আর সেখানে দেখা হয় বাঘের সাথে। পিঠা খাওয়ার লোভে বাঘ সমস্ত সামগ্রী জোগার করে দেয় 'চড়া'কে। আর 'চড়া' বাঘকে বলে যে যখন তার বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখবে তখন যেন বাঘ যায় পিঠা খেতে। 'চড়া'র কথা মতো বাঘ অপেক্ষা করে। আর বিকেলে ধোঁয়া দেখে অনেক আশা নিয়ে বাঘ 'চড়া'র বাড়িতে যায় পিঠা খেতে। পিঠার বদলে তার মুখে পরে 'চড়া' আর 'চড়ী'র বিষ্ঠা। আবার 'চড়া'র বায়ুত্যাগের শব্দে মাটির কলস ভেঙ্গে গেলে ভয় পেয়ে বাঘ দৌড়ে পালায় জঙ্গলে। পিঠা খাওয়ার লোভে বাঘ 'চড়া'কে এত সাহায্য করলেও সামান্য 'চড়া' আর

'চড়ী'র কাছে অপদস্থ হতে হয় তাকে। এমনকি পিঠা ভেবে 'চড়া-চড়ী'র বিষ্ঠা খায়। বাঘের পক্ষে যা খুবই অপমানজনক। উপকারীর উপকার মনে না রাখা বা উপকারীকে ফাঁকি দেবার প্রবণতা একশ্রেণির মানুষের চিরন্তন। এই গল্পটিতে তার ইঙ্গিত মেলে।

এধরনের আরও বহু লোককথা পাওয়া যায় যেখানে অতি বলবান, হিংস্র আর চতুর জীব-জন্তু, পশু-পাখিকে তাদের তুলনায় কমজোর, সাধারণদের কাছে পরাজিত হতে দেখা যায়। যদিও কাহিনির মধ্যে এদের সরাসরি লড়াই থাকে না। কিন্তু একটা কূটনৈতিক ও বুদ্ধিমত্তার লড়াই থাকে। যেখানে সবলেরা দূর্বলের কাছে অপমানিত হয়। যেমন বাঘ, সিংহ, কাক ইত্যাদিকে তাদের তুলনায় সাধারণ খরগোশ, কৈ মাছ, ব্যাঙ, চড়াই পাখি ইত্যাদির কাছে পরাজিত হতে হয়েছে। তাদের অহংকারের পতন হয়েছে। এখানে বাঘ, সিংহ, কাক এরা যেন সমাজের ক্ষমতাধর আর শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি বলে আমাদের মানে হয়। আর অন্যদিকে খরগোশ, কৈ মাছ, ব্যাঙ, চড়াই পাখি সমাজের অতি সাধারণ ও শোষিত, বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি বলে অনুমান করা যায়। লোককথায় বিভিন্ন জীব-জন্তু, পশু-পাখিকে এক বিশেষ বিশেষ অর্থে বা প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। যেমন- শৃগাল, কাক অতি ধূর্ত ও চালাক। বাঘ, সিংহ অত্যাচারী ও হিংস্র। ছাগল, খরগোশ, চড়াই, কৈ মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি দুর্বল ও সাধারণ। ফলে এদের মধ্যে লড়াই ও প্রতিযোগিতা যে বিশেষ অর্থবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। এদের লড়াই ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আসলে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত লোকসাধারণের অবদমিত ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে। ধ্বনিত হয়েছে তাদের প্রতিবাদী কন্ঠ।

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত ব্রতকথা নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রতকথাগুলিতে গ্রাম বাংলার সাধারণ শ্রেণির মানুষের অভাব-অনটন, দুঃখ-যন্ত্রণায় জর্জরিত জীবনচিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ব্রতকথাগুলির মূল উদ্দেশ্য লৌকিক দেব-দেবী বা কাল্পনিক কোন অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করে মনোবাঞ্চা পূর্ণ করা এবং সংসারে শান্তি লাভ করা। স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্যদের মঙ্গল কামনা করা। অর্থের অভাব, সন্তান না থাকার দুঃখ ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য কোন না কোন দেব-দেবীকে ব্রত করে সন্তুষ্ট করা হয়। ব্রতকথায় একদিকে থাকে সাধারণ মানুষ যাদের সংসারে অভাব

অনটন। আর অন্যদিকে থাকে লৌকিক দেব-দেবী যাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আবার তাদের অবহেলা করলে তারা প্রচণ্ড রেগে যান এবং শাস্তি দেন। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নেন। নানা অসুখ-বিসুখে কষ্ট দেন। অপরদিকে আনুগত্য স্বীকার করলে, তাদের কাছে আশ্রয় নিলে, গুনগান করলে খুশী হয়ে দু হাত ভরে আশীর্বাদ দেন, বর দেন, কৃপা করেন। এই দুর্বল সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েই এই সব লৌকিক দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের পূজার প্রচার হয়। আবার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতেও তাদের বাঁধে না। দেব-দেবী হলেও মানুষের মত দোষ গুণ তাদের চরিত্রে লক্ষ করা যায়। ফলে তাদেরকে সমাজের উচ্চ শ্রেণির বা শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবেও দেখা যেতে পারে। যারা তাদের চাইতে নীচু স্তরের লোকেদের সব সময় নিজেদের অধীনে রাখতে চায়। দমিয়ে রাখতে চায়। তাই যারা তাদের অধীনে থাকতে চায় না বা তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, বিদ্রোহ করে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যারা তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, তাদের পূজা করে তাদের প্রতি তারা খুব ভালো। আবার যারা তাদের বিরোধিতা করে, অবহেলা করে তাদের জন্য তারা অসম্ভব খারাপ। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত ব্রতকথাগুলিতে আমরা এর সুন্দর চিত্র দেখতে পাই। যেমন 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩২) দেখা যায় যে দরিদ্র ছেলেটি তিল বিক্রি করে তার সংসার চালাতো। একদিন সে যখন তিলের ভার নিয়ে বাজারে যাচ্ছিল তখন ঝটপট ঠাকুর ছদ্মবেশ ধরে তাকে ডাক দেয়। কিন্তু বাজারে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে ছেলেটি তার ডাক না শুনে হাঁটতে থাকে। সে জানায় যে বাজারে গিয়ে তিল বিক্রি করলেই তার সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন জুটবে। কিন্তু ঝটপট ঠাকুরের দরিদ্র ছেলেটির প্রতি মায়া হয়নি। বরঞ্চ তাকে অবহেলা করায় তিনি রেগে যান। আর তার রোষে দরিদ্র ছেলেটির ভার ভেঙে সব তিল মাটিতে পড়ে যায়। ছেলেটি যখন অসহায় হয়ে কাঁদতে থাকে তখন তিনিই আবার ছদ্মবেশ ধরে এসে তার পান দেওয়ার অর্থাৎ পূজা দেওয়ার উপদেশ দেয়। আর এও জানিয়ে দেন যে ঝটপট ঠাকুরকে অবহেলা করার ফলেই তার এমন হয়েছে। আর তাই ছেলেটি যখন ঝটপট ঠাকুরের পান দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় তখন সে প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করে। এদিকে পাশের বাড়ির 'বইনারী' যখন ঠাকুরের পানকে অবহেলা করে তখন তার

পরিবারের সব লোকের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালের গরু, পুকুরের মাছ মরে যায়। কিন্তু এর পরক্ষণেই ভক্তিভরে ঠাকুরের পান খেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই সবাই প্রাণ ফিরে পায়।

'কর্মপুরুষের ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩১) দেখা যায় যে রাজার স্ত্রী হয়ে বড় বোন কর্মপুরুষের ব্রতের কথা ভুলে যায়। আর তাই রাজকোষ খালি হতে থাকে। অভাব অনটন শুরু হয়। আবার কোটালের স্ত্রী ছোটবোন নিয়মিত কর্মপুরুষের ব্রত করতে থাকায় দিন দিন কোটালের উন্নতি হতে থাকে। ছোট বোন ব্রত করে বড় বোনের জন্য প্রসাদ পাঠালে কর্মপুরুষ ঠাকুর তার প্রসাদ বড় বোনের কাছে পৌঁছাতে দেন না। শেষপর্যন্ত ছোটবোনের পরামর্শে বড় বোন ঠাকুরের ব্রত করলে আবারে তাদের সুখের দিন আসে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ সমস্ত কিছুই তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাদের কৃপা লাভ করতে পারলেই সুখে থাকা সম্ভব নইলে বিপদ। এখানে যেন প্রভূত্ববাদী মানসিকতারই প্রকাশ ঘটে।

একইভাবে 'বিপদ নাশিনীর ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩৩) দেখা যায় যে নিয়মিত ব্রত করার ফলে অসহায় মেয়েটি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পায়। কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। মৃত সন্তানকেও ফিরে পায়। আর অন্যদিকে তাকে অবহেলা করায় চতুর্থমঙ্গলের নিমন্ত্রিতরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু দেবীর ক্ষমতা বা মহিমাকে স্বীকৃতি দিলে বা মেনে নিলে তারা সুস্থ হয়ে পড়েন।

এইভাবে বিভিন্ন ব্রতকথায় লৌকিক দেব-দেবীদের দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মহিমা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তারা যে কোনো পর্যায়ে নামতে পারে। অসহায় ও দুর্বলদের প্রতি কঠোর রূপ নিতে পারে। যদিও এতে তাদের মহানতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর দরিদ্র অসহায় মানুষ নিরূপায় হয়ে তাদের কৃপা লাভ করে বেঁচে থাকে। ফলে এখানে সমাজের দুইটি শ্রেণির চিত্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যেখানে দুইটি শ্রেণি পাশাপাশি থাকবে সেখানে দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকাটাই স্বাভাবিক। যেমন মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর আর মনসার কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্য তো আসলে লোককথারই ঐতিহ্যাশ্রয়ী। লিখিত সাহিত্যের রূপ লাভ করলেও মনসার ব্রত কথা আজও লোকসমাজে প্রচলিত। ব্রতকথাগুলিতে যদিও শেষপর্যন্ত দেব-দেবীর মহিমাই

প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি আধিপত্যবাদী, প্রভূত্ববাদী সমাজচিত্রই যেন এরমধ্যে প্রতিফলিত হয়।

লোকসমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্রটি লক্ষ করা যায় লোককথায় উপস্থাপিত চরিত্রগুলির মাধ্যমেও। যেমন উদাহরণ স্বরূপ ব্রাহ্মণ চরিত্রের কথা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রেণি বিভাজিত সমাজে ব্রাহ্মণদের অবস্থান সমাজের সবচেয়ে উপরে। সমাজে তাদের একটা আধিপত্য থাকে সবসময়। পরোক্ষে তারা সমাজের প্রায় নিয়ন্ত্রকস্বরূপ। তাদের একটা পরোক্ষ শাসন যেন থাকে সমাজে। তারা যেমন জ্ঞানী পণ্ডিত তেমনি এরফলে অনেক সময় তারা হয়ে উঠেন অহংকারীও। জাত-পাতে তারা খুব বিশ্বাস করেন এবং ছোঁয়াছুয়িতেও তারা বিশ্বাসী। এইজন্য সবসময় তারা নিম্নবর্গের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। যেমন তারা অন্যের অন্ন গ্রহণ করেন না। অন্যের সাথে বসেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এর ব্যতিক্রমও যে লক্ষ করা যায় না এমন নয়। সাধারণ মানুষের থেকে এইভাবে দূরত্ব বজায় রাখার ফলে তাদের প্রতি যেমন ভয়মিশ্রিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকে তেমনি আবার মনে থাকে ক্ষোভ আর অসম্মান। এর ফলে ব্রাহ্মণকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ লোকমুখে শোনা যায়। ছড়া প্রবাদ ধাঁধা ইত্যাদিতে ব্রাহ্মণকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাশা করা হয়েছে। যেমন বরাক উপত্যকায় দুলাইনের একটি ছড়া শোনা যায়- 'ওঁ নমঃ তুলসী পাতা। বাবনে (ব্রাহ্মণে) খায় পাঠার মাথা।।' আবার এজাতীয় কিছু প্রবাদপাওয়া যায় যেমন-'এক বাব্নে মারলো বাড়ি। নকুড়ি বাব্নর লড়ালড়ি।।' কিংবা 'আছিল ধোপার বাবন, পড়িয়া অইছে ভট্'। লোককথায়ও ব্রাহ্মণ চরিত্রকে যেমন সৎ, সহজ-সরল হিসেবে দেখানো হয়েছে, তেমনি আবার লোভী, অহংকারী ইত্যাদি হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে। অনেক সময় তাদেরকে হাসির পাত্র করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে নিয়ে অনেক হাসির গল্প প্রচলিত রয়েছে। ব্রাহ্মণকে নানাভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। সমাজের একেবারে নীচু স্তর বা অতি সাধারণ শ্রেণির লোকের কাছে বারবার লজ্জিত হতে হয়েছে। যেমন কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত 'ব্রাহ্মণ ও তার ভৃত্য' (লোককথা সংখ্যা-২১) লোককথাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোককথাটিতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণকে তার নিজের ভৃত্যের কাছে বারবার অপদস্থ

হতে হয়েছে। এমনকী ব্রাহ্মণ ভৃত্যের হাতে কিল ঘুষি পর্যন্ত খেয়েছে। ভৃত্য প্রথমে শ্বশুর বাড়ীর জন্য নিয়ে যাওয়া সব কলা খেয়ে শেষ করে। তারপর তারা যখন মধ্যাহ্ন আহারে বসে তখন ভৃত্য ব্রাহ্মণের আহারকে অপবিত্র করে দেয়। এর ফলে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকে। ভৃত্য ব্রাহ্মণের খাবারটুকুও খেয়ে নেয়। এরপর কথার চালাকিতে বারবার ব্রাহ্মণকে বাজিতে পরাজিত করে কিল ঘুষি দেয়। ব্রাহ্মণ যখন খিদের জ্বালায় মরছিল তখনও চালাকি করে ভৃত্য শাশুড়িকে দিয়ে এমন খাদ্য পরিবেশন করায় যা ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় না। ভৃত্যের হাতে বারাবার অপদস্থ হয়ে ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চিঠি লিখে ছোট ভাইয়ের কাছে পাঠায়। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই চালটিও উল্টো পরে যায়। আবার চালাকি করে ব্রাহ্মণের ভাইজিকে বিয়ে করে নেয় ভৃত্য। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে গো হত্যার মতো মস্ত পাপ হয়েছে। ব্রাহ্মণ লুকিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েও অপদস্থ হয়। ভৃত্য চালাকি করে ব্রাহ্মণের গোহত্যার বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেয়। ফলে গ্রামবাসীরা সবাই ব্রাহ্মণকে অপমান করে চলে যায়। এইভাবে ব্রাহ্মণকে তার ভৃত্যের হাতে বারবার অপদস্থ হতে হয়েছে। আসলে এই গল্পটিতে আধিপত্য বিস্তারের ধরনটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যাকে সহজভাবে বলা যায় চোরের ওপর বাটপাড়ি করা।

'কৈ মাছের লোভ' (লোককথা সংখ্যা-১৮) লোককথাটিতে লোভী ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা কৈ মাছ বেশি খাওয়ার লোভে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী গ্রামবাসীদের কাছে নিজেদের হাসির পাত্র করে তুলে। আগে ঘুম থেকে উঠলেই বা আগে কথা বললে একটা কৈ মাছ কম খেতে হবে তাই দুজনের কেউই ঘুম থেকে উঠে না। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করে তাদের ঘুম থেকে উঠাতে পারে না। গ্রামবাসীরা যখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীকে মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে যায় তখনও তারা কৈ মাছের লোভ ছাড়তে পারে না। শেষপর্যন্ত যখন চিতায় তুলে আগুন দিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা তখন 'আমি তিনটি খাব' 'আমি তিনটি খাব' বলে চিৎকার করে উঠে আর গ্রামবাসীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কৈ মাছ খাওয়ার লোভে ব্রাহ্মণের এমন আচরণ নিশ্চয়ই স্বাভাবিক এবং শোভনীয় নয়। এর মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বা ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে না। ঠিক একইভাবে 'বাবনা শীত' (লোককথা সংখ্যা-১৯) লোককথাটিতেও ব্রাহ্মণকে হাসির পাত্র করা হয়েছে। দরিদ্র

ব্রাহ্মণ লেপের অভাবে শীতে কষ্ট পায়। লেপ বানানোর টাকা না থাকায় ব্রাহ্মণ কোনোভাবে এই শীতটা কাটিয়ে দিতে চায়। কারণ শীত প্রায় শেষ হওয়ার পথে। কিন্তু শীত শেষ হতে হতে আবার খুব বেশি করে জাঁকিয়ে বসে। শেষপর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ তার একমাত্র গরুটি বিক্রি করে নতুন লেপ বানিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেদিন নতুন লেপ নিয়ে আসে সেদিন থেকেই শীত শেষ হয়ে যায়। এইভাবে দেখা যায় ব্রাহ্মণকে নিয়ে লোককথায় নানাভাবে হাসিঠাট্টা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে নানাভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। যা ব্রাহ্মণ চরিত্রের পক্ষে মানানসই মনে হয় না। ব্রাহ্মণ চরিত্রে এমন সব আচরণ দেখা যায় যা তাদের চরিত্রের সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। আসলে এ যেন ব্রাহ্মণদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে থাকা ক্ষোভ এবং বিরূপ মনোভাবেরই প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> 'গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এইরকমের একটি প্রতিবর্তন হয়ে থাকে। এই ব্যপারটিই লোকসমাজের মনে নিজেদের অজ্ঞাতে অর্থনৈতিক অসাম্যজনিত একটি শ্রেণির পার্থক্যগত অনুভব সৃষ্টি করে। সেই অনুভবগুলিই প্রতিবর্তিত হয়ে ঐসব প্রতীক, সংকেত, রূপক ইত্যাদিকে মাধ্যম রূপে তৈরি করে এবং সেই শ্রেণি পার্থক্যের বোধকেই প্রকাশিত করে তাদের সূত্রে।'

বরাক উপত্যকার লোককথার বিশ্লেষণেও শ্রেণি বিভাজিত সমাজের চিত্রটিই অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সমাজ একটি সংঘবদ্ধ জীবন প্রক্রিয়া। এখানে একা কেউ থাকতে পারে না। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতায় সমাজ এগিয়ে যায়। তাই সমাজে মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজন চলতে পারে না। ফলে সাহিত্য তথা অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজের যে চিত্র আমরা পাই তাতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তিধারী মানুষের পরিচয়ও সন্নিবিষ্ট হয়। লোককথায়ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি মানুষের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য ও খাদ্য সংস্থানের জন্য বিভিন্ন রকমের পেশা বেছে নিতে হয়েছে। পেশা সাধারনতঃ কোন একটি স্থানের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, নদী-নালা, পাহাড়,

পর্বত, উদ্ভিদ, প্রাণী, জাতি, ধর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বরাক উপত্যকায়ও বিভিন্ন পেশা তথা জীবিকার বিভিন্ন মাধ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময় বরাক উপত্যকা ছিল নদী মাতৃক বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরাক উপত্যকার জনজীবন মূলত গড়ে উঠেছে সুরমা আর বরাক নদীর তীরে। এছাড়াও একদিকে যেমন রয়েছে বড়াইল পাহাড় তেমনি রয়েছে বিশাল সমতল ভূমি। বরাক উপত্যকা মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ফলে এ অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি-ক্ষেত, মৎসপালন ও পশুপালন। এছাড়াও কামার, কুমার, স্বর্ণকার, বৈদ্য, বণিক, মালাকার, তাঁতী, নাপিত, জ্যোতিষ, ছুতার, রজক, জেলে, মাঝি, ওঝা, ঘটক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশা ও বৃত্তিধারী সম্প্রদায় রয়েছে।

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত লোককথায়ও বরাকের বিভিন্ন পেশাধারী সম্প্রদায়ের লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা - ১০) লোককথায় বিভিন্ন পেশাদারী লোকের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কাক যখন 'চড়া বন্ধের' বুক খাওয়ার জন্য ঠোঁট ধূতে নদীতে যায় তখন নদী তাকে 'লোটা' (ঘটি) নিয়ে আসতে বলে। তাই কাক ছুটে যায় কুমারের কাছে। তখন কুমার কাককে বলে মাটি নিয়ে আসার জন্য। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে কাকের প্রয়োজন হয় কামারের (কর্মকার)। তাই কাক ছুটে যায় 'কামারে'র কাছে। লোককথাটিতে দেখা যায় যে কাকের একটি কাজের জন্য অনেকের প্রয়োজন হয়। একা কেউ কাজটি সম্পন্ন করতে পারে না। সমাজে প্রত্যেকে যে বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ এই বিষয়টি এই লোককথায় সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়।

বাঙালির ব্রত-পার্বন ও উৎসব অনুষ্ঠানে 'তিল'-এর এক বিশেষ স্থান রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তিল অপরিহার্য। যেমন- নবান্ন উৎসবকে এ অঞ্চলে বলা হয় 'তিল সংক্রান্তি'। আর এ উৎসবে তিলের নাড়ু অপরিহার্য। ওইদিন তিলের নাড়ু খাওয়ার নিয়ম। এছাড়া আসামে লোকখাদ্যের তালিকায় 'তিলের পিঠা' অতি জনপ্রিয়। ফলে এ অঞ্চলের বাণিজ্যে তিলের যে বড় স্থান রয়েছে তা বলাবাহুল্য। যদিও এ অঞ্চলে তিলের চাষ তেমন জনপ্রিয় নয়। তথাপি বাণিজ্য ক্ষেত্রে তিল কোনোভাবে পিছিয়ে নেই। 'কাঁঠাল পাখি' (লোককথা সংখ্যা-১১) এবং 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩২)

তিলের বাণিজ্যের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেমন 'কাঁঠাল পাখি'-র লোককথায় যে মেয়েটির কাহিনি পাওয়া যায় তার বাবার ছিল তিলের ব্যবসা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিল বিক্রি করতেন তিনি। সৎমা মেয়েটিকে দিয়ে সমস্ত দিন তিল ধুয়ে পরিস্কার করে রোদে শুকানোর কাজ করাতো। 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা'য়ও হাটে নিয়ে তিল বিক্রি করতে দেখা যায়। অর্থাৎ তিল বিক্রিকেও যে অনেকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল তারই পরিচয় বরাক উপত্যকার লোককথায় আমরা দেখতে পাই। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌবাণিজ্যের এক বড় সুযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বরাক উপত্যকায় মনসামঙ্গল তথা চাঁদসদাগরের কাহিনি অতি জনপ্রিয়। বলা হয় এ অঞ্চলে মনসা পূজার ব্যাপকতা দুর্গা পূজার চাইতেও বেশি। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গ্রাম বরাকে এমনকি শহরেও নিয়ম করে পুরো মাস পদ্মাপুরাণ গান করা হয়। ফলে বলা যায় যে বরাক উপত্যকার লোকজীবনে সদাগর চরিত্র খুবই সুপরিচিত। এখানকার লোককথায়ও তাই সদাগরের কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়। এমনই দুটি লোককথা হচ্ছে 'সদাগর ও ময়নাপাখি' (লোককথা সংখ্যা-২৫) এবং 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩)। 'সদাগর ও ময়না পাখি' লোককথায় দেখা যায় যে সদাগর নানা দেশ ঘুরে বাণিজ্য করত। বাণিজ্য শেষে অনেক দামী দামী জিনিস পত্র নিয়ে ফিরত। অনেক সময় দীর্ঘ সময়ের জন্য বাণিজ্যে যেত। যেমন এখানে সদাগর বারো বৎসরের জন্য বাণিজ্যে বেরিয়েছিল। বাণিজ্য যাত্রায় বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সদাগরের অনুপস্থিতিতে তার বাণিজ্য দেখা শোনার জন্য থাকত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী, উজির-নাজির আর পেয়াদা। 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা'য় সদাগর আর তার সাত ছেলের কাহিনি পাওয়া যায়। সদাগর মারা যাবার পর তার সাত ছেলে বাণিজ্য যাত্রা করে। আবার বাণিজ্য শেষে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরে। তাদের একমাত্র বোনকে বিয়ে দেয় বণিকের পরিবারে। ফলে সদাগর ও বণিক সম্প্রদায় যে এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার এক অঙ্গ ছিল তা এই লোককথা দুটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। পাশাপাশি এই লোককথার উৎস নদীমাতৃক বাংলাদেশ বা এই বরাক উপত্যকাও হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ অপরিহার্য। ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ জীবনের কথা কল্পনা করা যায় না। লোককথায়ও ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি ব্যাপক। ব্রাহ্মণদেরকে

নিয়ে প্রচুর লোককথা এ অঞ্চলেও প্রচলিত। লোককথায় ব্রাহ্মণদের জীবন চিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে তাদের জীবন ধারণের জন্য যজমানি ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। অনেকে জ্যোতিষ বিদ্যাকেও পেশা হিসেবে বেছে নেন। 'ভাগ্যফল' (লোককথা সংখ্যা-২৪) লোককথাটিতে আমরা এর পরিচয় পাই। হস্তরেখা এবং ভাগ্যফলে বিশ্বাসী মানুষের অভাব নেই এই পৃথিবীতে। বলতে গেলে অধিকাংশ মানুষ ভাগ্য গণনা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। সবাই নিজের ভাগ্যকে জানতে চায়। কুষ্ঠি, ঠিকুজি, বিয়ে ভালোমন্দ ইত্যাদি বিচারের জন্য মানুষকে জ্যোতিষের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। ফলে যারা জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী তাদের অর্থোপার্জনের একটা সুযোগ এসে যায় এই মাধ্যমে। যেমন আলোচ্য লোককথাটিতে দেখা যায় ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূর দূর থেকে লোকজন আসে তার কাছে নিজের ভাগ্য জানতে। সেইরকমই বণিকের স্ত্রী তার কাছে এসেছিল নিজের ভাগ্য জানতে। 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়' (লোককথা সংখ্যা-১৭) লোককথাটিতেও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষবিদ্যা জানার কথাটি প্রচার হবার পর রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠান এবং ব্রাহ্মণের পরীক্ষা নেন। সৌভাগ্যবশত পরীক্ষায় সফল হওয়ায় রাজা ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করেন। রানীর গলার হার বের করে দেবার পর ব্রাহ্মণ রাজ জ্যোতিষীর মর্যাদা লাভ করেন। ফলে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে সমাজে জ্যোতিষীদের বিশেষ কদর অন্যান্যদের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। আর অর্থ উপার্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ফলে অনেক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষবিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন স্বাভাবিকভাবে। একাংশ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই বিদ্যাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। জ্যোতিষীবিদ্যার পেশা বর্তমানকালেও অনেক জনপ্রিয়। এবং অর্থ উপার্জনের এক বড় মাধ্যম। ভিক্ষা বৃত্তিকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতেও দেখা যায় অনেক ব্রাহ্মণকে। 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩১) এমন একজন ব্রাহ্মণের পরিচয় পাই যিনি ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন। ভিক্ষা করে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। তাই ব্রাহ্মণের সংসার অভাব অনটনে পূর্ণ। যদিও কর্মপুরুষের কৃপায় ব্রাহ্মণের সংসারের অভাব দূর হয়। অনেক ব্রাহ্মণ ঘটকালি করে সংসার প্রতিপালন করেন। অর্থাৎ ঘটকালিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> ‘এ সমস্ত পেশা ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের মর্যাদা নির্দেশ করে। এরূপ ব্রাহ্মণরা তাদের পেশার ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বসবাস করে। এই ধরনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, এরা মন্দির ও টোলকে জীবিকার উত্তম উপায় হিসেবে বেছে নেয়।” [৩]

সুতরাং ব্রাহ্মণদের জীবন ধারনের জন্য অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যমকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে দেখা যায়। বরাক উপত্যকার লোককথায়ও এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের উপস্থিতি ছাড়াও বরাক উপত্যকার লোককথায় বৈদ্য, কবিরাজদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসক হিসেবে সমাজে এদের এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকে। রাজা থেকে শুরু করে সব শ্রেণির মানুষের চিকিৎসা করে থাকেন তারা। ‘বড় বউ আর ছোট বউ’ (লোককথা সংখ্যা-১৪) লোককথাটিতে বৈদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কাহিনিতে বৈদ্যকে ছোট বউয়ের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সামিল হতে দেখা যায়। এছাড়া দাস-দাসীরও উল্লেখ পাওয়া যায় বরাক উপত্যকার লোককথায়। যেমন ‘ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়’ (লোককথা সংখ্যা-১৭) লোককথাটিতে বিধি নামের রাজবাড়ির দাসীকে রানীর গলার হার চুরি করতে দেখা যায়। যদিও ব্রাহ্মণের কাছে সে ধরা পড়ে যায় এবং ব্রাহ্মণের পরামর্শ মতো শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে রানীর হার ফিরিয়ে দেয়। ‘ব্রাহ্মণ ও তার ভৃত্য’ (লোককথা সংখ্যা-২১) লোককথায় চতুর ভৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে তার মনিব ব্রাহ্মণকে নানাভাবে অপদস্থ করে। ভৃত্যের হাতে ব্রাহ্মণ বার বার পরাজিত হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যাহ্ন আহার কেড়ে নেয় বুদ্ধি বলে। আবার বাজিতে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করে। চালাকি করে ব্রাহ্মণের ভাইঝিকে বিয়ে করে। এইরকম নানাভাবে চালাক ভৃত্যের হাতে ব্রাহ্মণ অপদস্থ হয়। এখানে মনিব এবং ভৃত্যের সংঘাতের চিত্র ফুটে উঠে। কারন ভৃত্য যে তার মনিবের সঙ্গে এমন ধরনের আচরণ করে এর পশ্চাতে আসলে রয়েছে অবদমিত ক্ষোভ। বরাক উপত্যকার লোককথায় অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি লোকেদের পাশাপাশি দাসবৃত্তিধারী চরিত্রেরও যে বিশেষ স্থান রয়েছে একথা উপরোক্ত

লোককথা দুটি থেকে প্রতীয়মান হয়।

গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে প্রাচীন প্রথা ছিল, বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথায় তার পরিচয়ও আমরা পাই। 'গুরু শিষ্যের লড়াই' (লোককথা সংখ্যা-১৫) শীর্ষক লোককথায় সন্ন্যাসী গুরুর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। কাহিনি মতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ নিজের দুই ছেলের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত তথা ভালো গুরুর সন্ধান করেন। শেষপর্যন্ত তন্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী এক সন্ন্যাসীর কাছে নিজের দুই ছেলেকে সমঝে দেন। যাতে তারা ভালো শিক্ষা লাভ করতে পারে। গুরুদক্ষিণা হিসেবে সন্ন্যাসী দুই ছেলের মধ্যে যে কোনো একজন ছেলেকে দাবি করেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর শর্তে রাজী হন। শিক্ষা সম্পন্ন হবার পর সন্ন্যাসী ছোটো ছেলেকে নিজের কাছে রাখতে চান। কারণ ছোট ছেলে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু বুদ্ধিমান ছোটছেলে সন্ন্যাসীর মতলব বুঝতে পেরে বাবার সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা করে তার দাদাকে সন্ন্যাসীর কছে রেখে চলে যায়। ফলে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বড় ছেলেকে মেরে ফেলে। আবার ব্রাহ্মণ ছেলেকে দেখতে এলে মন্ত্র দিয়ে তাকে জীবিত করে দেন। নিজ শিষ্য তথা ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেকে জব্দ করার জন্য সন্ন্যাসী অনেক চেষ্টা করে শিষ্যের কাছে হার মানে। এইভাবে শিক্ষা গুরু তথা তন্ত্রসাধক সন্ন্যাসী চরিত্রের পরিচয় এই লোককথায় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং বরাক উপত্যকায় প্রচলিত লোককথায় সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি মানুষের উপস্থিতি সমাজের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে। সমাজে প্রত্যেকেই অপরিহার্য। পরস্পর নির্ভরশীল। একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজন চলতে পারে না। কিন্তু বর্ণবিভাজিত সমাজে কখনো কখনো উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদ লক্ষ করা যায়। ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের। এই উপত্যকার লোককথায় এই সমাজ ব্যাবস্থার বাস্তব চিত্রই যেন নানাভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পরিবার। একাধিক পরিবার নিয়েই সমাজ গঠিত। লোককথায় সমাজ জীবনের চিত্র যেমন অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তেমনি পারিবারিক তথা গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রও এতে নানাভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। কেননা লোককথার মূলে হয়েছে লোকমন। পরিবারের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, সম্পর্কের

টানাপোড়েন ইত্যাদি লোককথার অন্যতম উপজীব্য বিষয়। অন্যান্য অঞ্চলের মত বরাক উপত্যকার লোককথায়ও পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। পরিবারের মূল ভিত্তি হল সম্পর্ক বা স্বজন সম্পর্ক। সমাজ এক পরোক্ষ নিয়ম নীতি মেনে টিকে থাকে। যে সমস্ত সম্পর্ক সমাজের সেই নিয়ম নীতি মেনে গড়ে উঠে তা সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সম্পর্ক। আবার এমন কিছু সম্পর্কও কখনো গড়ে উঠে যা সমাজের নিয়ম নীতি বহির্ভূত। ফলে এই সম্পর্কগুলো অবৈধ সম্পর্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক পরিবারে এবং সমাজে একে অন্যকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে।

সম্পর্ক গড়ে উঠে দুভাবে। প্রথমত, জন্মের দ্বারা আর দ্বিতীয়ত, বিবাহের দ্বারা। জন্মগত সম্পর্কের মধ্যে পাই- মা, বাবা, ভাই-বোন, জ্যাঠা-জ্যাঠী, কাকা-কাকী, মাসী-পিসি, মামা-মামী, দিদা-দাদু, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, তুতোভাই, তুতো বোন, বৌদি, জামাইবাবু প্রমূখ। বিবাহ পরবর্তী সম্পর্ক হলো- শ্বশুড়-শাশুড়ি, ভাসুর-দেবর, ননদ-ননাস, মাসী-পিসি শাশুড়ি, দাদা শ্বশুড়-দিদি শাশুড়ি, জামাইবাবু, তুতো ভাসুর-দেবর, বেয়াই-বেয়ান, ভায়রা, শালা-শালী ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে বিমাতা এবং সতীন সম্পর্ক। বরাক উপত্যকার লোককথায় এধরনের মিষ্টি মধুর সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমে লোককথাগুলোতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস করা হল।

<u>মা</u> ঃ লোককথায় অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। মা স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতায় পরিপূর্ণ। মা'র হৃদয় সর্বদাই স্নেহ-বিহ্বল ও কোমল। সন্তানকে সুখে রাখার জন্য মা শত সহস্র ক্লেশ জ্বালা সহ্য করে থাকেন। রাজমাতা থেকে দীন-দুঃখিনী মায়ের চরিত্র লোককথায় পাওয়া যায়। মা যে কোনো অবস্থায়ই থাকুননা কেন তার হৃদয় সবসময় সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রতী। সন্তানের সুখই একমাত্র তার কাম্য। পারিবারিক নানা অসুবিধা, কলহ, সংকটে তিনি সবাইকে আগলে রাখেন। যেমন 'মিষ্টি লাউ গাছ' (লোককথা সংখ্যা-১৩), 'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪), 'সোনার গাছ রূপার পাত তায় হীরামন তোতা পাখি নৃত্য করে' (লোককথা সংখ্যা-২৯) লোককথাগুলিতে

মা চরিত্রের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক কষ্ট করে ও ত্যাগ স্বীকার করে সন্তানদের সমস্ত আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে দেখা যায়। তবে অনেক সময় এর পাশাপাশি বিপরীত চরিত্রও লক্ষ করা যায়। যেমন- 'মিষ্টি লাউ গাছ' এবং 'বড় বউ আর ছোট বউ' লোককথা দুটিতে দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে গর্ভধারিনী মা আর অন্যদিকে সৎ মা। গর্ভধারিনী মা নিজ সন্তানকে প্রাণ-পণ ভালোবাসেন। আর অন্যদিকে সৎ মা সতীনের সন্তানের প্রতি হিংসামূলক আচরণ করেন। 'মিষ্টি লাউ গাছ' লোককথায় দেখা যায় যে মা মারা যাবার সময়ও নিজের মেয়ের কথা ভাবে এবং প্রিয় মিষ্টি লাউ গাছের সঙ্গে মিশে থাকতে চায় যাতে নিজ মেয়েকে সব সময় দেখতে পারেন। 'বড় বউ আর ছোট বউ' লোককথায় দেখা যায় কচ্ছপে রূপান্তরিত হয়ে যাবার পরও নিজের সন্তানদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেন মা। তাদের যথাসম্ভব যত্ন নেবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে স্নেহময়ী মায়ের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় লোককথাগুলিতে। আবার অন্যদিকে মায়ের প্রতি সন্তানের অবহেলার চিত্রও ফুটে উঠতে দেখা যায় 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩২)। দেখা যায় যে বিয়ের পর ছেলে মার থেকে আলাদা হয়ে যায়। যা সমাজের এক নিষ্ঠুর ও করুণ বাস্তব চিত্র। তবে এই ব্রতকথাটিতে দেখা যায় শেষপর্যন্ত ঝটপট ঠাকুরের কৃপায় মায়ের সঙ্গে ছেলের মিলন হয় এবং সংসারের অভাব অনটন দূর হয়। প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে যে 'কুপুত্র যদিবা হয় কুমাতা কখনও নয়।' লোককথায়ও মায়ের যে চরিত্র দেখা যায় সেখানেও চিরন্তন মায়ের আদর্শই ফুটে উঠে। অভাব অনটনে নিজে অনাহারে থেকে সন্তানের মুখে অন্ন জুগিয়েছে। মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেছেন মা। ফলে বলা যায় যে মাতৃপ্রতিমার বাস্তব চিত্রই লোককথায় অঙ্কিত হয়েছে। মাতৃহৃদয়ের সুন্দর পরিচয়ও একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে।

বাবা ঃ মায়ের পাশাপাশি একই আসনে অধিষ্ঠিত বাবা। বাবা হলেন একটি পরিবার বা সংসারের কর্তা। বাবা একদিকে যেমন স্নেহশীল-সন্তানবৎসল তেমনি আবার কর্তব্যপরায়ণ। অনেক সময় আবার কঠোরও। বাবার স্নেহের সাথে মিশে থাকে শাসন। লোককথায় মাতৃপ্রতিমা যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি বাবার চরিত্রও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজা থেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা অতিসাধারণ একজন পিতা হিসেবে সবই সমান।

সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও মঙ্গল কামনায় বাবা সবসময় সচেষ্ট এবং চিন্তিত থাকেন। আবার অনেক সময় কোনো কারণে বা চাপে তাকে অসহায়ও হয়ে পড়তে দেখা যায়। তবে সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা কোন অংশে কমে যায় না। বরাক উপত্যকার প্রচলিত বহু লোককথায় বাবা চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোনার গাছ রূপার পাত তার উপরে হীরামন তোতায় নৃত্য করে' (লোককথা সংখ্যা-২৯), 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১), 'মিষ্টি লাউ গাছ' (লোককথা সংখ্যা-১৩) লোককথায় অসহায় বাবার চিত্র দেখা যায়। সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দেখা যায়। তবে মন থেকে সন্তানের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব থাকে না। মূলত পরিস্থিতির চাপে পড়ে কোন উপায় না পেয়ে সন্তানদের প্রতি অন্যায় করে বসেন বাবা। তবে শেষপর্যন্ত বাবা নিজের সন্তানকে আবার বুকে টেনে নেন। যেমন 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা'য় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় স্ত্রীর চাপে পড়ে দুই মেয়েকে বনবাসে দিয়ে দেন। আবার কর্মপুরুষের কৃপায় যখন দুই মেয়ের সঙ্গে মিলন হয় তখন তার চোখে জল আসে। মেয়ের কাছে ক্ষমা চান। নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।

'সোনার গাছ রূপার পাত তার উপরে হীরামন তোতায় নৃত্য করে' রূপকথায় রাজা প্রথম স্ত্রীর সন্তানের চেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর দুই ছেলেকে বেশি ভালোবাসেন। তাই ছেলেরা যখন পিতার স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে অসাধ্য সাধনে যাত্রা করে তখন বড় রানীর ছেলেকে দেন ভাঙা নাও আর ছোটরানীর ছেলেদের ভালো নৌকা। অবশেষে ছোটরানীর দুই ছেলে তাদের কুকর্মের শাস্তি পায়। আর বড় রানীর ছেলেকে রাজা তার প্রাপ্য দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করেন। 'ডিশ্রু কথা' (লোককথা সংখ্যা-৩০) লোককথাটিতে দেখা যায় যে রাজা ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবেন তার হাতেই নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এখানে বাবাকে মেয়ের ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন বলেই মনে হয়। বাবার এক কঠোর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। অন্যদিকে 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা'য় (লোককথা সংখ্যা-৩৩) দেখা যায় সদাগর তার সন্তানদের খুব বেশি ভালোবাসেন। তাই মৃত্যুর সময় সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি ছেলেদের বারাবার নির্দেশ দিয়ে যান যাতে তারা তাদের বোনকে ভালো করে আদর যত্ন

করে দেখে রাখে। 'গুরু শিষ্যের লড়াই' (লোককথা সংখ্যা-১৫) শীর্ষক লোককথাটিতে দায়িত্বশীল পিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তিনি তাদের শিক্ষিত করে তুলতে চান। আর এরজন্য তিনি ভালো গুরুর সন্ধান করেন। এবং অনেক খোঁজাখুজির পর সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেন। ফলে দেখা যায় যে বরাক উপত্যকার লোককথায় বাবা চরিত্র এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। একদিকে কর্তব্যপরায়ণ ও কঠোর বাবার চিত্র যেমন আছে তেমনি অন্যদিকে স্ত্রীর হাতের পুতুল হয়ে সন্তানদের প্রতি অবহেলা এ বৈষম্যমূলক আচরণ করা অসহায় বাবার পরিচয়ও পাওয়া যায় লোককথায়। ফলে লোককথায় বাবা চরিত্রের যে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই।

ভাই-বোন ঃ পরিবারে ভাই-বোন এক মধুর সম্পর্ক। ভাই বোনের মধ্যে যেমন অকৃত্রিম ভালোবাসা ও হৃদয়ের টান থাকে তেমনি থাকে একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা। ভাই বোন কে নিয়ে ভাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান রয়েছে বঙ্গদেশে। বরাক উপত্যকায়ও বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভাতৃদ্বিতীয়া। ভাই বোনের সম্পর্কের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠে ভাতৃদ্বিতীয়ার ছড়ায়-

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা
যমুনায় দেয় যমরে ফোঁটা
আমি দেই ভাইরে ফোঁটা' অথবা
'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমদুয়ারে দিলাম কাঁটা
ফোঁটা যেন নড়ে না
ভাই যেন মরে না।"

বরাক উপত্যকার লোককথায় ভাই-বোন সম্পর্কের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'ভাই বোনের কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-১২)তে দেখা যায় ভাই বোনকে রক্ষা করার জন্য বাঘের সাথে লড়াই করে। ভাই ভালো করেই জানত যে বাঘের সঙ্গে সে

কখনো পেরে উঠবে না তথাপি বোনকে রক্ষা করার জন্য জেনেশুনে মৃত্যুকে বরণ করে। এদিকে বোন ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ভাইয়ের সন্ধানে বোন পাখি হয়ে উড়ে যায়। ভাই বোনের অগাধ ভালোবাসার পরিচয় ফুটে উঠে এই লোককথায়। একইরকমভাবে 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩)য় বোনের প্রতি সাতভাইয়ের ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। বোনের প্রতি অন্যায় করায় সাতভাই তাদের ছয় স্ত্রীকে শাস্তি দেয়। এবং ভালো পরিবারে বোনের বিয়ে দেয়। যা সমাজের এক বাস্তব চিত্র। এইভাবে বরাক উপত্যকার লোককথায় ভাই-বোন সম্পর্কের অতি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়।

স্বামী-স্ত্রী ঃ পরিবার ও সমাজের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক। ফলে সাহিত্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক যে বিশেষ স্থান দখল করে থাকবে তা স্বাভাবিক। বরাক উপত্যকার লোককথায়ও আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করি। বিশেষ করে বাংলার ব্রতকথাগুলিতে গার্হস্থ্য জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীরা মূলত ব্রত করেন স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনায়। আবার কুমারী মেয়েরা ব্রত করেন আদর্শ স্বামীর কামনায়। পরিবার ও বাবা-ভাইয়ের মঙ্গল কামনাও অবশ্য থাকে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের আদর্শ পরিচয় পাওয়া যায় সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনিতে। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য সাবিত্রী স্তব করে যমকে তুষ্ট করেছিলেন এবং যম মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সতী সাবিত্রীর পতিপ্রেম দেখে যমরাজ সত্যবানের চরশো বৎসর আয়ু দান করেছিলেন। পতিপ্রেমের এমন উদাহরণ নিশ্চয় বিরল। স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে যে সবসময় সিরিয়াস কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-তামাসার গল্পও সৃষ্টি হয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর অটুট বন্ধনে যেমন অনাবিল আনন্দ ভালোবাসা রয়েছে তেমনি হয়েছে কলহ আর মান-অভিমানও। আর এসব নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মিষ্টি মধুর সম্পর্ক। যেমন- 'কৈ মাছের লোভ' (লোককথা সংখ্যা-১৮) লোককথাটিতে দেখা যায় একটি কৈ মাছ বেশি খাওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। একটি কৈ মাছের মায়া কেউ ছাড়তে পারে না। বাজি ধরে মরার মতো পড়ে থাকে দুজনে। আর গ্রামবাসীরা মৃত ভেবে দুজনকে শ্মশানে নিয়ে চিতায়

তুলে আগুন দিয়ে দেয়। তখনও দুজনে আমি খাবো আমি খাবো বলে চিৎকার করে উঠে। এরফলে গ্রামবাসীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীদের কাছে স্বাম-স্ত্রী দুজনে হাসির পাত্র হয়ে উঠে। আসলে কৌতুক বা হাস্যরসই এই এমন কাহিনির মূল উদ্দেশ্য। এতে স্বামী-স্ত্রীর অম্ল মধুর সম্পর্কের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠে।

একই রকম ভাবে 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়' (লোককথা সংখ্যা-১৭) লোককথাটিতে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। লোককথাটিতে দেখা যায় যে স্বামী না দেখে না গুনে পিঠার সংখ্যা বলে দিতে পারে দেখে স্ত্রী ভেবে নেয় যে স্বামী নিশ্চয়ই গণনা জানেন। আর তাই স্ত্রী স্বামীর এই মহৎ গুণের কথা চারদিকে প্রচার করে দেন। যদিও এর ফলে স্বামীকে অনেক বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। অবশ্য ভাগ্যের কৃপায় সব বিপদ কাটিয়ে স্বামী অনেক লাভবান হন। রাজার অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনেক ধন সম্পত্তি ও রাজজ্যোতিষের মর্যাদা লাভ করেন। যদি স্ত্রী এমন প্রচার না করতেন তাহলে ব্রাহ্মণের এমন সুদিন আসার সম্ভাবনা কম ছিল। ফলে স্ত্রীর বোকামির ফলে স্বামীর লাভই হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় 'চড়াই ও চড়ুনীর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-৮)তেও। 'চড়া'র পিঠা খাওয়ার ইচ্ছা হলে 'চড়ী' পিঠা বাননোর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এনে দিতে বলে। 'চড়া' জঙ্গলে গিয়ে বাঘের সাহায্যে সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করে। এর সঙ্গে বাঘকে নিমন্ত্রণও করে আসে। কিন্তু পিঠা বানানোর পর 'চড়া-চড়ী' দুজনে মিলে সব পিঠা খেয়ে নেয়। বাঘের জন্য একটাও থাকে না। তাই যখন বাঘ পিঠা খাওয়ার জন্য আসে তখন 'চড়া-চড়ী' মাটির পাত্রে লুকিয়ে থাকে। ভালো মন্দ সবসময়ই দুজনে একসঙ্গে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের পাশাপাশি তিক্ত সম্পর্কের চিত্রও বরাক উপত্যকার লোককথায় পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় বিনা দোষে বা নানা কারনে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ এবং অত্যাচার করেন। যেমন, 'সোনার গাছ রূপার পাত তার উপর হীরামন তোতা পাখি নৃত্য করে' (লোককথা সংখ্যা-২৯) রূপকথায় দেখা যায় যে সন্তান না হওয়ার অপরাধে রাজা বড় রানীকে রেখেই আবার বিয়ে করেন। এবং নতুন রানীর জন্য বড় রানীকে 'ঝুপরি' বানিয়ে আলাদা করে থাকতে দেন। 'বড় বউ আর ছোট বউ'

লোককথাটিতে দেখা যায় ছোট বৌয়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে থাকে। কিন্তু স্বামী এর প্রতিবাদ করে না। কারন ছোট স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসে তাই। স্বামী-স্ত্রীর এমন বিচিত্র ধরনের সম্পর্ক যে বর্তমান কালেও একেবারে বাস্তব এনিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফলে লোককথায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের যে অতি বাস্তব সম্মত ও সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে তা বলা বাহুল্য।

জামাই ঃ জামাইয়ের সম্পর্কটি যেমন স্নেহের তেমনি আবার রসিকতাপূর্ণও। জামাইকে কেন্দ্র করে বহু হাসির গল্প সৃষ্টি হয়েছে। শালা শালীর সঙ্গে জামাইবাবুর সম্পর্ক অতি মধুর এবং হাসি ঠাট্টা ও রঙ্গরসিকতার। অন্যদিকে শাশুড়ি সবসময় সচেতন থাকেন জামাইয়ের আপ্যায়ণ ও আদর যত্নে। শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের কদরই আলাদা। জামাইয়ের জন্য 'জামাইষষ্ঠী' বলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচলিত রয়েছে বঙ্গদেশ। লোকসাহিত্যেও জামাই এবং শ্বশুর বাড়ির এক বিশেষ স্থান রয়েছে। বরাক উপত্যকার একটি প্রবাদে পাওয়া যায়-' শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি, তিনদিন পরে হুরইন বাড়ি'। অর্থাৎ একটানা বেশিদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকলে জামাইয়ের আদর কমে যায়। এইভাবে জামাইকে নিয়ে বেশ মজার মজার লোককথারও প্রচলনও রয়েছে এ উপত্যকায়। বেশিরভাগ লোককথায় দেখা যায় যে জামাইকে বোকা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জামাইয়ের নানা আচরণকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা করা হয়েছে। অনেক শ্লীলতার সীমাও ছাড়িয়ে গেছে। জামাইকে লোভী, অপদার্থ হিসেবেও তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> 'যতদিন পর্যন্ত পুরুষ নারীকে হরণ করে বিবাহ করেছে ততদিন পর্যন্ত মেয়ের বাবা মায়ের ক্রোধ প্রবল ছিল হরণকারীদের প্রতি। পরে বিষয়টি অনানুষ্ঠানিক হয়ে যাওয়ায় ক্রোধ পরিণত হয় পরিহাসে। অন্যদিকে শাশুড়ি মেয়ের অধিকার ছাড়তে চায় না, জামাইও স্ত্রীর উপর শাশুড়ির প্রভূত্বকে স্বীকার করে না। আবার যৌবনবতী স্ত্রীর ভবিষ্যরূপ বিগত যৌবনা, অজাচার ভীতি উভয়ের মধ্যে পরিণত হয় পরিহাসে। অন্যদিকে শাশুড়ি মেয়ের অধিকার ছাড়তে চায় না, জামাইও স্ত্রীর উপর শাশুড়ির প্রভূত্বকে স্বীকার করে না। আবার যৌবনবতী স্ত্রীর ভবিষ্যরূপ বিগত যৌবনা,

অজাচার ভীতি উভয়ের মধ্যে এর সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে মনস্তাত্ত্বিক কারনেই শাশুড়ি-জামাই বিষয়ক গল্পগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। বোকা জামাইকে পরিহাস করে একদিন যেমন শাশুড়ির কন্যার প্রতি অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেবার ইচ্ছা, অন্যদিকে অবদমিত কামনার পথ থেকে সরে আসা - এই বোধগুলি কাজ করে লোকমানসে।"

ফলে সহজেই বুঝা যায় যে পারিবারিক ও সমাজিক জীবনে জামাইয়ের মূল্য এবং গুরুত্ব এক বিশেষ ধরনের।

বরাক উপত্যকার প্রচলিত 'জামাইয়ের কাঁঠাল খাওয়া' (লোককথা সংখ্যা-২৬) লোককথাটি জামাইকে নিয়ে রচিত। লোককথাটি মূল হাস্যরস। লোককথাটিতে এক বোকা জামাইয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দেখা যায় জামাই শ্বশুর বাড়ি আসার পর শ্বশুর শাশুড়ি শালা শালি সবাই জামাইয়ের আদর যত্নে ব্যস্ত। অনেক ভালো ভালো খাবার জামাইয়ের সামনে পরিবেশন করা হয়। কিন্তু জামাইয়ের সব কিছুতেই শুধু না না। ফলে সবাই নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। আর এদিকে কিছু না খেয়ে জামাই বাবাজীর কাহিল অবস্থা। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে জামাই রাত্রি বেলা রান্না ঘরে গিয়ে কিছু না পেয়ে। কাঁঠাল খেতে শুরু করে। এমনকি কাঁঠালের বুথু পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। শেষপর্যন্ত শ্বশুর বাড়ির লোকেদের হাতে ধরা পড়ে অনেক অপমানিত হন। এইভাবে জামাইয়ের বোকামিতে সবাই হাসি আটকে রাখতে পারে না। 'ব্রাহ্মণ ও তার ভৃত্য' (লোককথা সংখ্যা-২১) লোককথাটিতে জামাইয়ের শ্বশুর বাড়ি যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ 'কলার ছরি' ও আরো অনেক সামগ্রী নিয়ে যান। যদিও তার ভৃত্য মাঝপথে সব শেষ করে দেয়। আবার জামাই এসছে শুনে শাশুড়ি জামাইয়ের জন্য যত্ন করে রান্না করেন। কিন্তু ভৃত্যের জন্য ব্রাহ্মণকে অনেক দুর্গতি পোহাতে হয়। এইভাবে দেখা যায় যে লোককথার জগতে জামাই এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। জামাইকে নিয়ে বহু লোককথা প্রচলিত আছে। জমাইয়ের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

শাশুড়ি ঃ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শাশুড়ি এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বেশিরভাগ ভেত্রেই শাশুড়িকে দেখা যায় কর্তৃত্বপ্রবণা ও কঠোর প্রকৃতির। শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক বড় তিক্ত-

মধুর। কর্তৃত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে সব সময় যেন একটা অঘোষিত লড়াই চলতে থাকে। তবে শাশুড়ি-বধূর মধ্যে মধুর সম্পর্কের দৃষ্টান্ত যে একেবারে পাওয়া যায় না তেমন নয়। তবে তুলনায় তা কম। বরাক উপত্যকার লোককথায় শাশুড়ির উপস্থিতি তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। 'জামাইয়ের কাঁঠাল খাওয়া' (লোককথা সংখ্যা-২৬) এবং 'ব্রাহ্মণ ও তার ভৃত্য' (লোককথা সংখ্যা-২১) লোককথা দুটিতে শাশুড়ির উল্লেখপাওয়া যায়। তবে কাহিনিতে তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

শ্বশুর ঃ শাশুড়ির মতোই উল্লেখযোগ্য চরিত্র শ্বশুর। তবে শাশুড়ির মতো কঠোর প্রকৃতির নয়। শ্বশুর সম্পর্ক শ্রদ্ধা আর সম্মানের। তিনি পরিবারের কর্তা। ফলে পুত্রের সাথে পুত্রবধূরা শ্বশুরকে পিতা রূপেই মেনে নেন। এবং পিতার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করে। লোককথায়ও শ্বশুর চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩)য় পরিবারের কর্তা হিসেবে শ্বশুরের উল্লেখ রয়েছে। বরকইন্যার শ্বশুর একটি দীঘি খনন করেন। কিন্তু দীঘিতে জল উঠে না। বিপদনাশিনী স্বপ্ন দেখা দিয়ে বলেন যে তার নাতির গলা কেটে পুকুরে দিলে তবেই জল উঠবে। বরকইন্যা শ্বশুরের আশা পূরণের জন্য নিজ সন্তানের গলা কেটে পুকুরে ফেলে দেয়। অবশ্য দেবীর কৃপায় আবার সন্তানকে ফিরে পায়। এখানে শ্বশুরের প্রতি পুত্রবধূর শ্রদ্ধা ভক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বন্ধু-বান্ধবী বা সখা-সখী সম্পর্ক ঃ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বন্ধু-বান্ধবী বা সখা-সখী সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্ক বাঁধা থাকে বিশ্বাস আর ভালোবাসার মধ্যে। রক্ত বহির্ভুত সম্পর্কের মধ্যে এই সম্পর্কের স্থান বিশেষ। সাহিত্যেও বন্ধু সম্পর্কের এক বিশেষ স্থান লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক যেখানে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, জাত-বর্ণের বিভেদ নেই। কৃষ্ণ-সুদামার বন্ধুত্ব এই সম্পর্কের উজ্জ্বল উদাহরণ। লোককথায়ও বন্ধু সম্পর্কের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বহু লোককথা পাওয়া যায় যা দুই বা ততোধিক বন্ধুকে নিয়ে প্রচলিত। লোককথায় দেখা যায় যে রাজপুত্রের সাথে কোটাল পুত্রের বা মন্ত্রী পুত্রের বন্ধুত্ব, বিভিন্ন জীব-জন্তু, পশু-পাখির মধ্যে বন্ধুত্ব। তবে বন্ধুত্ব সম্পর্কের মধ্যে অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বরাক উপত্যকায়ও এজাতীয় বহু লোককথা প্রচলিত। যেমন- 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব' (লোককথা সংখ্যা-৫), 'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-১০)। এছাড়া 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১)য় রাজা এবং কোটালের বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব', 'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' লোককথা দুটিতে বন্ধুত্ব সম্পর্কের মধ্যে প্রতারণার চিত্র দেখা যায়। বানর প্রতিদিন কুমীরকে মিষ্টি কালোজাম খাওয়াতো। কুমীর নিজে খেয়ে স্ত্রীকেও নিয়ে দিত খাওয়ার জন্য। বানরের দেওয়া কালোজাম খেয়ে কুমীরের স্ত্রী ভাবে নিশ্চয় বানরের কলিজা খুব মিষ্টি হবে। তাই কুমীরের স্ত্রী কুমীরকে বলে বানরের কলিজা নিয়ে আসতে। কুমীর স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণের জন্য বানরকে পিঠে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে থাকে। কুমীরের বুদ্ধির অভাব ছিল। তাই কথাটি আগেই বলে দেয় বানরকে। আর তাই বুদ্ধিমান বানর কলিজা গাছে রেখে এসেছে বলে কুমীরকে বোকা বানিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। একইরকমভাবে 'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' লোককথাটিতেও বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোককথাটিতে দেখা যায় যে বন্ধু চড়ার সুস্বাস্থ্য দেখে কাকের লোভ হয়। আর তাই 'চড়া বন্ধের বুক' খাওয়ার জন্য ফন্দি করে। যদিও শেষপর্যন্ত কাক তার বদ মতলবের উপযুক্ত শাস্তি পায়।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে একজন আরেকজনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেমন দেখা যায় তেমনি এর বিপরীতে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণও পাওয়া যায়। 'কাক এবং চড়াইর কিচ্ছা' এবং 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব' লোককথা দুটিতে বন্ধুত্বের বিপরীত দিকের চিত্রটির পরিচয় পাওয়া যায়। যা সমাজের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র।

মামা ঃ মায়ের ভাই হলো মামা। মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক বেশ মজার। যেমন 'চাঁদ মামা', 'বাঘ মামা'র সাথে শিশুদের কাল্পনিক সম্পর্ক। ছোটবেলায় শিশুরা চাঁদ মামা আর বাঘ মামার সাথে পরিচিত হয়। আবার অন্যদিকে 'কংস মামা' আর 'শকুনি মামা'র উদাহরণও রয়েছে। লোকসাহিত্যেও মামা ভাগ্নের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন প্রবাদে পাওয়া যায় 'মামা ভাগ্না যেখানে আপদ নাই সেখানে', 'মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প' ইত্যাদি। লোককথাতে বাঘ মামা ও শিয়াল ভাগ্নের অনেক মজার মজার চিত্র পাওয়া

যায়। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত 'নরিহরি দাস' (লোককথা সংখ্যা-২৭) লোককথাটিতে দেখা যায় বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেকে সিংহের ভাগিনা বলে পরিচয় দিয়েছে। 'কর্মপুরুষ ঠাকুরের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১)য় দেখা যায় ব্রাহ্মণ দুই মেয়েকে মামার বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলে বনে রেখে এসেছিল।

ননদ ঃ স্বামীর বোন হল ননদ। বিবাহের মাধ্যমে এই সম্পর্কের জন্ম হয়। ননদ বৌদির সম্পর্ক তিক্ত মধুর। কোন কোন ক্ষেত্রে যেন একটা কর্তৃত্বের লড়াই থাকে। ফলে অনেক সময় সংঘাত বাধে। লোকসাহিত্যে এই সম্পর্কের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন একটি প্রবাদ- 'যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা'। লোককথায়ও ননদ-বৌদির সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে। যেমন 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩)য় দেখা যায় বরকইন্যাকে তার বৌদিরা দেখতে পারে না। তাই সাত ভাই যখন বাণিজ্যে দূরে চলে যায় তখন ছোট বৌদি ছাড়া অন্য ছয় বৌদি বরকইন্যাকে নানাভাবে অত্যাচার করে। এমনকি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করে। সংসারের সমস্ত কাজ করায়। মাঠে গরু চড়াতে দেয়। বরকইন্যা মরে গেছে বলে সাক্ষী তৈরি করে রাখে। যাতে ভাইয়েরা এসে তাদের কুকর্মের কথা জানতে না পারে। তবে ছোট বৌদির সঙ্গে বরকইন্যার সম্পর্ক ভালো থাকে। ছোট বৌদি তাকে রক্ষা করে। তাই শেষপর্যন্ত সাত ভাই মিলে ছয় বৌকে তাদের কর্মের শাস্তি দেয়। ফলে এই ব্রতকথাটিতে একই সঙ্গে ননদ-বৌদির ভালো-মন্দ দুধরনের সম্পর্কের পরিচয় ফুটে উঠে। অনেক সময় ননদের দ্বারা বৌদিকেও অত্যাচারিত হতে দেখা যায়।

শালা-শালী ঃ শালা-শালী হলো রসিকতা পূর্ণ এক মজার সম্পর্ক। জামাইবাবুর সঙ্গে সবসময় শালা-শালীর রঙ্গরসিকতাপূর্ণ আসর জমে থাকে। বলা হয় শালা-শালী না থাকলে শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের আনন্দ থাকে না। লোকসাহিত্যে এই সম্পর্কের বিশেষ স্থান রয়েছে। যেমন-বরাক উপত্যকার একটি প্রচলিত প্রবাদে পাওয়া যায় 'চোরে চোরে আলি এক চোরে বিয়া করে আরেক চোরের হালি'। তবে লোককথায় এই সম্পর্কটি তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। 'জামাইয়ের কাঁঠাল খাওয়া' (লোককথা সংখ্যা-২৬) লোককথাটিতে শালীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেখানে শালীকে জামাইবাবুর আদর যত্ন করতে দেখা যায়।

জা ঃ যৌথ পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক জা। দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের মধ্যে জা-এর সম্পর্ক হয়। জা-দের মধ্যে ভালো এবং মন্দ এই দুই ধরনের সম্পর্কই থাকতে দেখা যায়। দুই জায়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক না থাকলে পরিবার ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার ভালো সম্পর্ক থাকলে পরিবারের চিত্র অন্যরকম হয়। বরাক উপত্যকার লোককথায় জা সম্পর্কের খুব বেশি পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা - ৩৩)টিতে সাত জায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতকথাটিতে দেখা যায় যে সাত জায়ের মধ্যে ছোট জা ব্যতিক্রম। কারন অন্য ছয় জা মিলে তাদের ননদ বরকইন্যার উপর অত্যাচার করে। তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ছোট জা বরকইন্যাকে ভালোবাসে এবং তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। ফলে জায়েদের ভালো মন্দ দুইধরনের চিত্রই ব্রতকথাটিতে পাওয়া যায়।

ঠাকুরমা-ঠাকুরদা-দাদু-দিদা ঃ পরিবারের সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক হচ্ছে নাতি-নাতনির সঙ্গে ঠাকুরমা-ঠাকুরদ-দাদু-দিদার সম্পর্ক। যেখানে স্নেহ-মমতা-আদর-ভালোবাসা আর আবদারের বাইরে প্রায় আর কিছু থাকে না। লোকসাহিত্যে বিশেষ করে লোককথার ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নাতি-নাতনিরা ঠাকুরমা ঠাকুরদার কাছ থেকেই বেশি লোককথা শোনে থাকে। কারন তাদের হাতে প্রচুর সময় থাকে। ফলে তারা নাতি-নাতনির সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। নাতি-নাতনিদের মজার মজার গল্প শুনিয়ে তারাও আনন্দ পান। লোককথার সংকলনগুলোতে তাই দেখা যায়- 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে' ইত্যাদি।

সতীন ঃ পারিবারিক জীবনে সতীন সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। বহুবিবাহ প্রথার ফলে এই সম্পর্কের সৃষ্টি। মেয়েদের কাছে সতীন সম্পর্ক অভিশাপ স্বরূপ। অনেক মেয়েকে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয়। সাহিত্যে এই সম্পর্কের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লোকসাহিত্যে সতীন সম্পর্কের অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিমাতা ঃ সতীনের মতই পরিবারের আরেকটা অংশ বিমাতা বা সৎমা। যে পরিবারে সতীন থাকে সেই পরিবারে অনেক সময় বিমাতা সমস্যারও সৃষ্টি হয়। বিমাতা

হলেন মায়ের সতীন। বিমাতা তার সতীনের সন্তানদের প্রতি অনেক সময় বৈমাতৃসুলভ আচরণ করেন। হিংসা করেন বা অন্যায় আচরণ করেন। অবশ্য অনেক সময় এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। তবে তুলনায় কম। লোককথায় বিমাতা চরিত্রের চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বরাক উপত্যকায় প্রচুর লোককথা পাওয়া যায় যেখানে বিমাতা চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ফলে বিমাতা চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লোককথা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ফসল। ফলে গোষ্ঠীসমাজ এবং পরিবার লোককথার অন্যতম উপজীব্য বিষয়। আর তাই পারিবারিক চরিত্রের ভীড় এখানে লক্ষণীয়। একই পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তিক্ত-মধুর, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নানা চিত্র লোককথায় ফুটে উঠে। বিশেষভাবে লোককথায় একান্নবর্তী তথা যৌথ পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়। যা বর্তমান কালে লুপ্তপ্রায়। লোককথায় আমরা একই পরিবারে দাদা-ঠাকুরমা আর নাতি-নাতনির সম্পর্ক, জায়েদের মধ্যে সম্পর্ক, দুই সতীনের লড়াই, শাশুড়ি বধূর সম্পর্ক, বিমাতা-সন্তানের সম্পর্ক ইত্যাদির সুন্দর চিত্র দেখতে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> 'আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। .... সমস্ত রূপক ও বর্ণনার বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী বিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িণীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিকজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।"[৫]

লোককথার আতুরঘর লোককসমাজ। ফলে লোকসমাজের নানা চিত্র যেমন উৎসব-পার্বন, ব্রত, রীতি-নীতি, খাদ্য-পোষাক ইত্যাদির পরিচয় ফুটে উঠে। পরিবার নিয়ে গঠিত হয় সমাজ। আর পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে 'বিয়ে' এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। কেননা বিয়ের মাধ্যমেই সামাজিকভাবে পুরুষ-মহিলা নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। 'বিয়ে' এক

পারম্পরিক অনুষ্ঠান। সভ্য সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ থেকেই এই রীতি প্রচলিত হয়েছে। লোককথাতেও তাই বিয়ের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩)য় সদাগরের মেয়ে বরকইন্যার বিবাহানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় যে বিবাহ উপযোগ্যা হবার পর ভালো বর সন্ধান করে এক সদাগর পুত্রের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে বিয়ের চতুর্থ দিন এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয় যা 'চতুর্থ মঙ্গল' নামে পরিচিত। যেদিন নববধূ নিজ হাতে রান্না করে নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করেন। বরকইন্যার চতুর্থমঙ্গল অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রতকথাটিতে। দেখা যায় যে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন বরকইন্যার গায়ে অলঙ্কার না থাকায় প্রতিবেশী মহিলারা তার নিন্দা করেন। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনার সূত্রপাত হতে দেখা যায়।

পারিবারিক আরেকটি অনুষ্ঠান 'অন্নপ্রাশন' অর্থাৎ সন্তানের মুখেভাত। পুত্র সন্তানকে ছয় বা আট মাসে আর কন্যা সন্তানকে পাঁচ বা সাত মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখেভাত দেওয়া হয়। সামর্থ অনুযায়ী আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের ভোজন করানো হয়। বরাক উপত্যকার লোককথায় এই অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গটিও এসেছে। যেমন- 'লোভী ব্রাহ্মণ' (লোককথা সংখ্যা-২০) লোককথাটিতে দেখা যায় রাজার সন্তানের মুখেভাত উপলক্ষে ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়। গ্রামের সবাই এ উপলক্ষে পেট ভরে ভোজন করে। দরিদ্র ব্রাহ্মণও সেখানে পেট ভরে ভোজন করে। ব্রাহ্মণের ভোজনকে কেন্দ্র করে গল্পটিতে হাসির সৃষ্টি হয়।

লোকসাহিত্যে মেয়েদের এক নিজস্ব জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ করে ব্রতকথায় মেয়েদের কামনা বাসনার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা যেন এক নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলে। ব্রতগুলোতে পুরুষের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজনও হয় না। উপাদান বা উপকরণ হিসেবে থাকে একেবারে সহজলভ্য এবং ঘরোয়া উপাদান। যেমন- ধান, দূর্বা, বেলপাতা, আমপাতা, ফুল ইত্যাদি। ঘট বসিয়ে পাঁচালি পড়ে বা ব্রতকথা শুনিয়েই ব্রত সম্পন্ন হয়। ব্রতকথাগুলির মধ্যে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। পাশাপাশি মেয়েদের মনের কথা, দুঃখ-

কষ্টের প্রকাশ ঘটে। বরাক উপত্যকায় অনেক ব্রতের প্রচলন রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি ব্রতের সঙ্গে পাওয়া পায়। বরাক উপত্যকার ব্রতকথাগুলিতে মেয়েদের নিজস্ব জগতের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি সংসার তথা গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রও এতে পাওয়া যায়। যেমন- 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩২) তে দেখা যায় যে ঝটপট ঠাকুরের ব্রতের উপাদান এক পয়সার 'গুয়া' (সুপারি), এক পয়সার পান, এক পয়সার তামাক ও এক পয়সার তিল। ঝটপট ঠাকুর তাই ছেলেটিকে এই জিনিসগুলো জোগার করতে বলে। এবং সোমবার ও শুক্রবার তার ব্রত করতে বলে। ঠাকুর আরো বলে যে 'বিন্না' গাছে তিনটি 'গাইট' দিয়ে তার মনের কথা বলতে। একইরকমভাবে 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১), 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৩), 'সুপারিশ ঠাকুরের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৪), 'বাবাহরের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩৫) ইত্যাদিতে ব্রতের পরিচয় ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়।

ব্রতকথাগুলিতে সাধারণ মানুষের অভাব অনটন পূর্ণ সংসারের চিত্র ফুটে উঠে। সংসারের অভাব যাতে দূর হয়। স্বামী, সন্তান যাতে সুখে থাকে। আবার নিজের কামনার মধ্যে থাকে স্বামী সৌভাগ্যবতী হওয়া, পুত্রসন্তানের মা হওয়া। মেয়েদের এই কথাটির মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিত্র খোঁজে পাওয়া যায়। 'পতি পরমেশ্বর' বা 'পতি নারায়ণ' এমন এক প্রচলিত মেয়েদের মনে স্থান করে নেয়। যার ফলে তারা স্বামীর ভালোবাসা পাওয়াকে নিজের সৌভাগ্য বলে ভাবে। আর তাই ঠাকুর দেবতার কাছেও এমন বর কামনা করে। আবার পুত্র সন্তানের কদর বা আদর বেশি। তাই মেয়েদের কামনা থাকে পুত্র সন্তানের মা হওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -

> "নারীকেন্দ্রিক ব্রতাচার এবং মৌখিক সাহিত্যে, সমাজ-মনস্তত্ত্বেরই অভিক্ষেপ ঘটেছে। এই কারণেই পুত্রসন্তান সেখানে শতকণ্ঠে উচ্চারিত কিন্তু কন্যা সন্তানের মঙ্গল কামনা, নীরবতায় লীন হয়ে আছে।" [৬]

পরিবারে মেয়েদের অবস্থানটি ব্রতকথার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। আবার অন্যদিকে সহজ সরল সাধারণ নারীর মাতৃত্ব, কোমলতা, কর্তব্যবোধ, উদারতা, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি মানবিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা,

নীচতারও ছবি পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্রতকথায়।

ব্রতকথা ছাড়া অন্যান্য লোককথায়ও নারীসমাজের চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যেমন- 'সোনার গাছ রূপার পাত তার উপর হীরামন তোতায় নৃত্য করে' (লোককথা সংখ্যা-২৯) রূপকথায় দেখা যায় যে সন্তানের জন্ম না হওয়ায় রাজা বড় রানীকে রেখে আবার বিয়ে করেন। আবার ছোট রানীর কথায় বড় রানীকে আলাদা করে দেন। রাজমহলের বাইরে একটি 'ঝুপরি' বানিয়ে থাকতে দেন। এই চিত্র যে শুধু যে রাজ পরিবারে দেখা যায় তেমন নয়। সাধারন পরিবারেও দেখা যায় যে সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রীকে দায়ী করা হয়। এবং স্বামী সন্তানের আশায় আবার বিয়ে করেন। এর ফলে পরিবারে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় তেমনি ব্যক্তিগত সংকটেরও সৃষ্টি হয়। পরিবারে থেকেও যেন আলাদা হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারও এর অন্যতম কারন। নিঃসন্তান দম্পত্তিকে সমাজে ভিন্ন চোখে দেখা হয়। এদের মুখ দেখা অশুভ বলে মানা হয়। এমনকী কোন ভিখারী ফকির পর্যন্ত নিঃসন্তান দম্পত্তির বাড়ি থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। আর এর জন্য দায়ী করা হত নারীকে। যার ফলে নারীকে ঘরে বাইরে দুই দিক থেকে আঘাত পেতে হয়। একদিকে স্বামী সতীন নিয়ে আসত আর অন্যদিকে সমাজ নিন্দা করত। অথচ নিজের অধিকার আদায় বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মত কোন পরিবেশ ছিল না।

প্রসঙ্গত 'ডিশ্রু কথা' (লোককথা সংখ্যা-৩০) লোককথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই লোককথাটিতে দেখা যায় যে রাজার পুত্র সন্তানের কামনা কোন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায়। শিকারে যাবার সময় রাজা রানীকে নির্দেশ দিয়ে যায়- পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তাকে যেন সোনার পালঙ্কে শোয়ানো হয়। আর কন্যা সন্তান হলে তাকে যেন জীবন্ত করব দেওয়া হয়। যদিও এর পেছনে যুক্তি ছিল জ্যোতিষের বাণী। জ্যোতিষ ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিল যে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে রাজ্যের নাম-যশ বাড়বে। আর কন্যা সন্তানের জন্ম হলে রাজ্য ধ্বংসের কারণ হবে। কিন্তু তবুও পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তানের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী তা এখানে স্পষ্ট হয়। পিতা হয়েও রাজা নিজ কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার আদেশ দিতে পেরেছে। আসলে এটাই সমাজের এক বাস্তব চিত্র যে পুত্রসন্তানের

জন্য সোনার পালঙ্ক আর কন্যা সন্তানের জন্য কবর। বর্তমানকালেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এর খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সমাজে নারী পুরুষের অবস্থানটি এই লোককথায় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪) লোককথাটিতেও দেখা যায় যে পুত্রসন্তান না থাকার জন্য বড় বৌয়ের প্রতি ছোট বৌয়ের হিংসা। আর এর জন্যই বড় বৌয়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে, তার উপর অত্যাচার করেছে ছোট বৌ। এমনকী প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। পুত্র সন্তানের কামনা একজন নারীকে যে কতটুকু হিংসুক বা অত্যাচারী করে তুলতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই লোককথাটিতে। ছোট বৌয়ের এমন মানসিকতার পেছনে যে পরোক্ষে পুরুষতন্ত্রের চিন্তা চেতনাই ক্রিয়াশীল থাকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীই হয়ে উঠে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি। যেমন এই লোককথায় দুই জায়ের মধ্যে সংঘাতের একটি কারণ ছিল পুত্র সন্তান। আর পুত্রসন্তানের কামনা তো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচায়ক। যার প্রকাশ ঘটেছে ছোট বৌয়ের চরিত্রে।

বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে যে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। আসলে এইভাবে প্রশস্তি গেয়ে বা প্রশংসা করে সংসারের অন্দর মহলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে নারীর হাতে। সংসারে সুখ শান্তি বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে নারী। স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনাই নারীর জীবনের অন্যতম ব্রত। অথচ সংসারে তার মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। লোককথাগুলিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- 'ডিশ্রু কথা' (লোককথা সংখ্যা-৩০)তেই দেখা যায় যে নিজের সন্তানকে নিয়ে রানীর কোন মতামত থাকে না। কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ায় রানী রাজাকে লুকিয়ে নিজের কন্যাকে বড় করে। সত্য কথাটি রাজার কাছে খুলে বলতে ভয় পায় শাস্তির ভয়ে। আবার সত্যকথা জানতে পেরে রাজা ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবেন তার হাতেই নিজের কন্যাকে তুলে দেবেন বলে ঘোষণা করেন। এখানেও মা হিসেবে রানীর কোন মতামত থাকে না। মতামত তুলে ধরার মত কোন সুযোগও থাকে না। একইরকমভাবে 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১) টিতেও দেখা যায় যে মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার কথা রাজা জানতেনই না।

আর যখন রাজা বুঝতে পারলেন যে মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবেন তার হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন। এইখানেও মা হিসেবে রানীর কোন ভূমিকা নেই। রানীর নিজের মতামত তুলে ধরার কোন সুযোগ নেই। শুধুমাত্র স্বামীর আদেশ পালন করা ছাড়া। আর বহু লোককথায় এমন চিত্র দেখা যায়। লোককথায় এটি একটি বিশেষ মটিফ। যেখানে দেখা যায় পুরুষই নারীর ভাগ্যনিয়ন্তা। সেখানে নারীর নিজের কোন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। যেমন রাজা সিদ্ধান্ত নেয় ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। অথচ ঘুম থেকে উঠে কাকে দেখবেন তার তো নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ যার তার হাতেই নিজের মেয়েকে তুলে দিতে রাজার কোন অসুবিধা নেই। মনে হয় মেয়েকে যে কোনভাবে ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়াই যেন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিত্রই যেন লোককথায় ফুটে উঠে।

লোককথায় আরও একটি জিনিস লক্ষ করা যায় যে অতি তুচ্ছ বা সামান্য কারণেই মেয়েকে বা স্ত্রীকে নির্বাসনে বনবাসে দেওয়া হয়। যেমন 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১)য় দেখা যায় দ্বিতীয় পত্নীর কুপরামর্শে ব্রাহ্মণ তার দুই কন্যাকে নির্বাসনে দেন। মামার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বনে ছেড়ে আসেন। নিত্যদিনের অশান্তি ব্রাহ্মণেরও ভালো লাগছিল না। তাই ব্রাহ্মণও ভাবে মেয়েদের দূরে সরিয়ে দিলে সংসারের নিত্যদিনের অশান্তি দূর হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্নীর কুপরামর্শের পাশাপাশি ব্রাহ্মণের নিজেরও সম্মতি ছিল। সম্পূর্ণ কাজটি তিনি চাপে পড়ে করেননি। বাবার এমন আচরণে বা সিদ্ধান্তে মেয়েদের কিছু করার ছিল না। বাবা হয়েও ব্রাহ্মণ দুই কন্যাকে এক অজানা ভবিষ্যতের পথে ছেড়ে দেন। ব্রতকথাটির শেষে অবশ্য দেখা যায় যে পিতার সাথে দুই মেয়ের মিলন হয়। এবং মেয়েরা বাবা-মাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করে বাড়ি নিয়ে আসে। মনে কোন ক্ষোভ তারা রাখে না। একজন পিতার কঠোর হৃদয় আর মেয়ের কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রতকথাটিতে। সুতরাং পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের অবস্থানটির সুন্দর প্রতিফলন দেখা যায় লোককথায়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ খাদ্য। প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী জন গোষ্ঠী এবং অঞ্চলের লোকসমাজে নিজস্ব খাদ্য থাকে। নিজস্ব বিশেষত থাকে।

লোককথায়ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উৎসব অনুষ্ঠানের মতো খাদ্য সামগ্রীরও পরিচয় ফুটে উঠে। বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথায় এ অঞ্চলের খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- 'জামাইয়ের কাঁঠাল খাওয়া' (লোককথা সংখ্যা-২৬) লোককথাটিতে জামাইয়ের কাঁঠাল খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও জামাইয়ের আদর যত্নে শাশুড়ি বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে। 'লোভী ব্রাহ্মণ' (লোককথা সংখ্যা-২০) লোককথাটিতে লোভী ব্রাহ্মণের ভোজনে ভাত, ডাল ও নানা রকমের ব্যঞ্জনের পাশাপাশি দৈ পায়েশ মিষ্টান্ন ইত্যাদি সুস্বাদু খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪) লোককথাটিতে কচ্ছপের মাংস খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানকালে কচ্ছপ মারা এবং কচ্ছপের মাংসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এক সময় এ অঞ্চলে কচ্ছপ পাওয়া যেত। কচ্ছপের মাংসেরও খুব চাহিদা ছিল। 'মিষ্টি লাউ গাছ' (লোককথা সংখ্যা-১৩) লোককথায় এখানকার স্থানীয় একটি জনপ্রিয় খাদ্য 'শুটকি' অর্থাৎ শুকনো মাছের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'শুটকি' বিশেষ করে 'সিঁদল' এ অঞ্চলের খাদ্য তালিকায় অতি সুপরিচিত। শ্রীহট্টের মনসামঙ্গলের কবি সংকলক রামচন্দ্র চৌধুরী তাঁর শ্রী শ্রী পদ্মাপুরাণ কাব্যে শুটকি অর্থাৎ সিঁদলের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। চাঁদসদাগর লঙ্কায় বাণিজ্যে গিয়ে বিভীষণের সঙ্গে দরবারে এক লক্ষ সিঁদলের বিনিময়ে পাঁচলক্ষ তোলা সোনা পেয়েছিলেন। কেননা সিঁদলের বর্ণনায় রাজা মুগ্ধ হয়েছিলেন। সিঁদলের গন্ধে রানী লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে অন্তঃপুর থেকে ছুটে আসেন রাজ দরবারে। কবি এর অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন-

"সিঁদলের চুঙ্গা সাধু হস্তে উঠাইয়া।
দুর্গা বলি চুঙ্গা ঢিপা দিলা খুলিয়া।।
ঢিপা খুলায় চতুর্দ্দিক গন্ধে ছাইল।
অন্তঃপুরে গন্ধ তবে প্রবেশ করিল।।
রাজমহিষী আইল ঘ্রাণ লৈয়া।
রাজ সভাতে আইলা নির্ল্লজ্য হৈয়া।।
সিঁদলের উগ্র গন্ধ যেই দিকে যায়।

কিবা নারী কিবা নর দ্রুত বেগে ধায়।।
অন্তরে ভাবিয়া বলে দ্বিজ রামচন্দ্রে।
লঙ্কা উদাস করিল সিঁদলের গন্ধে।।" [৭]

সিঁদল রান্না করার প্রক্রিয়ারও অতি সুন্দর বর্ণনা কবি তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে।

"সিঁদল খাইতে মিত্র একমত আছে।
স্পষ্ট করিয়া আমি বলি তোমার কাছে।।
অগ্নি মধ্যে সিঁদলকে কিঞ্চিৎ জ্বালাইয়া।।
কাঁচা মরিচ আদা লবণ মিশাইয়া।
মিশ্রিত করিয়া যদি করহ ভক্ষণ।
তবে সিঁদলের মর্ম্ম জানিবা আপন।।" [৮]

এখানে উল্লেখ্য যে সিঁদল রান্নার এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ। কেননা পিঁয়াজ আর রসুন ছাড়া 'শুটকি' বা 'সিঁদল' রান্না সুস্বাদু হয় না। আমাদের অনুমান হয় যে কবি হয়তো গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন, যার ফলে তিনি পিঁয়াজ আর রসুনকে ইচ্ছা করে বাদ দিয়েছেন। অথবা তিনি সঠিক ভাবে জানতেন না।

আদা, কাঁচামরিচ, পিঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে যেমন সিঁদল পুড়িয়ে সুস্বাদু রান্না হয় তেমনি লাউ ডাটা দিয়েও করা যায়। 'মিষ্টি লাউগাছ' লোককথাটিতে দেখা যায় যে বড় বউয়ের সুন্দর লাউ গাছটি দেখে ছোট বউয়ের 'শুটকি' খাওয়ার লোভ হয়। তাই বড় বউয়ের মেয়েকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠায় পিঁয়াজ, আদা, রসুন, তেল আর শুটকি নিয়ে আসার জন্য। শুটকির কথা শুনে বড় বউয়েরও লোভ হয়। তাই সে ও কিছু সব্জী দিয়ে দেয় মেয়ের হাতে, যাতে সেগুলো বিক্রি করে জিনিসগুলো একটু বেশি করে নিয়ে আসতে পারে। মেয়ে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী নিয়ে আসার পর ছোট বউ যত্ন করে লাউয়ের ডাটা দিয়ে শুটকি রান্না করে এবং অন্য কাউকে না দিয়ে সব একা খেয়ে নেয়। এতে বড় বউ আর তার মেয়ের মনে কষ্ট হয়। সুতরাং শুটকি এতদঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয় খাদ্য বলে লোককথায়ও স্থান করে নিয়েছে।

একইরকমভাবে এখানকার প্রচলিত বেশিরভাগ লোককথায় কচ্ছপের মাংস খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- 'বড় বউ আর ছোট বউ' লোককথাটিতে দেখা যায় যে ছোট বউ সতীন বড় বউকে মেরে ফেলার জন্য ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। কিন্তু বড় বউ পুকুরে পড়ে গিয়ে কচ্ছপ হয়ে যায়। আবার এই কথাটি যখন ছোট বউ জানতে পারে তখন কবিরাজের সঙ্গে বুদ্ধি করে সেই কচ্ছপের মাংস খাওয়ার পরিকল্পনা করে। ছোট বউ অসুস্থ হওয়ার ভান করে আর কবিরাজ বলে যে কচ্ছপের মাংস খেলে রোগ ভালো হয়ে যাবে। তাই পুকুর থেকে কচ্ছপ ধরে আনা হয়। বড় বউয়ের মেয়েকে দিয়ে সেই কচ্ছপ রান্না করানো হয়। ছোট বউ আর তার মেয়ে চেটে পুটে কচ্ছপের মাংস খায়। উল্লেখ্য যে, এ উপত্যকায় একসময় কচ্ছপের মাংস জনপ্রিয় খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল। এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যেত। স্বাভাবিক ভাবেই লোককথায়ও কচ্ছপের প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে। মণিপুরি 'শন্দ্রেম্বী চাইশ্রা' এবং অসমিয়া 'তুলা এবং তেজা' লোককথায়ও মরে কচ্ছপ হয়ে যাওয়া এবং কচ্ছপের মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

'পিঠা' বাঙালি সমাজের এক অতি প্রিয় ও সুখাদ্য। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে পিঠার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। পিঠা তৈরি করা অতি কষ্ট সাধ্য। তথাপি মেয়েদের ধৈর্য ধরে পিঠা তৈরি করতে দেখা যায় আজও। 'চড়াই ও চড়ুনীর কিচ্ছা' (লোককথা সংখ্যা-৮) তে পিঠা খাওয়ার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। লোককথাটিতে দেখা যায় যে 'চড়া'র একদিন পিঠা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করলে 'চড়ি' সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগার করে দিতে বলে 'চড়া'কে। বাঘের সাহায্যে 'চড়া'র পিঠা তৈরির সমস্ত সামগ্রী জোগার করে এনে দেয় 'চড়ি'কে। আবার পিঠা তৈরি করে বাঘের জন্য না রেখে নিজেরাই সব খেয়ে নেয়। পিঠা খাওয়াকে কেন্দ্র করেই লোককথাটি সৃষ্টি হয়েছে। 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়' (লোককথা সংখ্যা-১৭) লোককথাটিতেও পিঠার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ব্রাহ্মণের পিঠা খাওয়াকে কেন্দ্র করেই কাহিনির সূত্রপাত।

বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছ। মাছ ছাড়া বাঙালির খাদ্য তালিকা অসম্পূর্ণ। তাই লোকসাহিত্যে মাছের এক বিশেষ জায়গা রয়েছে। মাছ নিয়ে প্রচুর বাংলা প্রাবদ, ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- 'কৈয়ের তেলে কৈ ভাজা', 'গভীর জলের মাছ' ইত্যাদি। লোকগানেও

মাছের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তাই বরাক উপত্যকার লোককথায়ও মাছের প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবে। 'কৈ মাছের লোভ' (লোককথা সংখ্যা-১৮) লোককথাটিতে দেখা যায় কৈ মাছ খাওয়া নিয়ে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়া গিয়ে পৌছায় শ্মশান পর্যন্ত। মাছের প্রতি ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর লোভ কতটুকু তা সহজেই অনুমান করা যায়। আসলে প্রত্যেক বাঙালির ক্ষেত্রেই কথাটি প্রায় সত্য।

পূজা-পার্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খৈ। ধান থেকে উৎপন্ন খৈ বিভিন্ন ব্রত ও পূজা পার্বনে অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে বরাক উপত্যকার বহু লোককথায় খৈয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- 'কর্মপুরুষের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩১)। খৈয়ের মতই পূজা ও ব্রত পার্বনের প্রয়োজনীয় উপাদান তিল। 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথা' (লোককথা সংখ্যা-৩২), ও 'কাঁঠাল পাখি' (লোককথা সংখ্যা-১১) লোককথায় খৈ আর তিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও পান-সুপারি বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ। বিয়ে থেকে শুরু করে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে পান-সুপারি অপরিহার্য। অতিথি আপ্যায়ণের ক্ষেত্রেও পান সুপারি অতি সম্মানীয় উপাদনা বলে বিবেচিত হয়। মুখ শুদ্ধি হিসেবেও পান সুপারি উল্লেখযোগ্য। আর তাই লোকসংস্কৃতিতেও পান সুপারির বিশেষ স্থান রয়েছে। পান সুপারির সঙ্গে চূণ অপরিহার্য। এই তিনটি বস্তু একসঙ্গে মিশে রসনা তৃপ্তি মেটায়। 'পান সুপারি ও চূণের জন্ম কথা' (লোককথা সংখ্যা-২৮) নামে একটি লোককথা এ অঞ্চলে পাওয়া যায়। লোককথটিতে দেখা যায় কীভাবে এদের জন্ম হয়। 'ঝটপট ঠাকুরের ব্রতকথায়' (লোককথা সংখ্যা-৩২) পান আর সুপারির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুতরাং এইভাবে দেখা যায় যে লোককথায় সামাজিক পারিবারিক চিত্রে অঙ্গ হিসেবে খাদ্য সামগ্রীরও সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। জলবায়ু, আবহাওয়া ইত্যাদি নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যে খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠে তার পরিচয় ফুটে উঠে লোককথায়ও। বরাক উপত্যকার লোককথায়ও এ অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

লোককথায় লোকমনের ছবি প্রতিফলিত হয়। বহু বিচিত্র জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লোককথায় বিভিন্ন ভাবে স্থান পায়। পশু-পাখি, মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী প্রভৃতিকে

নিয়ে লোককথার জগৎ তৈরি হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণ বিভাজিত সমাজের শ্রেণি দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অধিকার আদায় ও অস্থিত্ব রক্ষার লড়াই, নানা ধরনের মিষ্টি মধুর সম্পর্ক, আচার অনুষ্ঠান, ব্রত পার্বন, খাদ্য, বিভিন্ন পেশাজীবি সমস্ত কিছুই লোককথায় ফুটে উঠে। তাই লোককথাকে লোক সমাজের দলিল বলা যেতে পারে। বরাক উপত্যকার লোককথায়ও বরাক উপত্যকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. চৌধুরী, ড° দুলাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১৭২।

২. সেনগুপ্ত, পল্লব ঃ লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা , ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১৪৭।

৩. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) ঃ লোককথার সাতকাহন, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৫০৯।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০৩।

৫. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার ও মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত) ঃ বাঙলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৯০-৯১।

৬. ইসলাম, শেখ মকবুল ঃ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান, তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩০৪।

৭. চৌধুরী, রামচন্দ্র ঃ শ্রী শ্রী পদ্মপুরাণ, প্রকাশক- নীলোৎপল চৌধুরী, শিলচর, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

৮. তদেব, পৃঃ ১৬৬।